মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘দুনিয়াতে দ্বিমুখী স্বভাবের মানুষদের ক্বিয়ামতের দিন আগুনের দু’টি জিহ্বা হবে’ *(আবূদাঊদ হা/৪৮৭৩)।*

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৪তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০২১

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريــــة علميـــــة دينيـــــة و أدبيـــــة

جلد : ٢٤، عدد : ٩، شوال و ذوالقعدة ١٤٤٢ھ/ يونيو ٢٠٢١م

رئيس مجلس الإدارة : **الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب**

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : সোকোল্লু মুহাম্মাদ পাশা মসজিদ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهريـــــة **ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش**

Monthly **AT-TAHREEK**

Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Am Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

ST **মেসার্স সুমন ট্রেডার্স**

প্রোঃ মোঃ জনাব আলী

M ০১৭১৫-৬৫১৭৫৭
G ০১৯১৯-৯৩৫৯৮৪
S ০১৭১১-৯৩৫৯৮৪

এখানে খেজুর, কিসমিস, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পেসতা বাদাম দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা, এলাচ, ধনিয়া, মহুরী, কালোজিরা, মেথি আমলা, তেজপাতা প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দোকান নং ৩৯-৪০, আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক
আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৪তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ ১৪৪২ হিঃ

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৮ বাং

জুন ২০২১ খৃঃ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া (আমচত্বর)

পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪

সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)

কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫

'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

ই-মেইল : tahreek@ymail.com

ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আদব সমূহ ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ জিহাদ আন্দোলন : আহলেহাদীছ জামা'আত ও হানাফী আলেমগণ *-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ১০

♦ নববী চিকিৎসা পদ্ধতি *(৩য় কিস্তি)* ১৩
-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী

♦ অল্পে তুষ্টি *(২য় কিস্তি)* *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ১৮

♦ ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য ২৩
-অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ **মনীষী চরিত :** ২৯

♦ শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) *(৮ম কিস্তি)* *-ড. নূরুল ইসলাম*

◈ **সাক্ষাৎকার :** ৩৪

♦ প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া

◈ **ইতিহাসের পাতা থেকে :** ৪২

♦ খলীফা ওমর (রাঃ)-এর অনুশোচনা

◈ **ক্ষেত-খামার :** ♦ দেশী পদ্ধতিতে সাম্মাম চাষে সাফল্য ৪৩

◈ **কবিতা :** ৪৪

♦ প্রাচুর্য

♦ জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

♦ করোনা থেকে বেঁচে লাভ কি?

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৫

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৬

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২৪তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০২১

বর্বর ইস্রাঈলী হামলা; ফিলিস্তীনের বিজয় আসন্ন

গত ১০ই মে ২৭শে রামাযান সোমবার দিবাগত রাত থেকে বিশ্বের বৃহত্তম কারাগার ফিলিস্তীনের গাযা সিটির উপর বর্বর ইস্রাঈলী বিমান হামলা শুরু হয়। যা মিসরের মধ্যস্থতায় ১১ দিনের মাথায় ২০শে মে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২-টায় ইস্রাঈলের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয়। ইস্রাঈল-ফিলিস্তীনের বর্তমান সংঘর্ষে ৬৬ জন শিশু ও ৩৯ জন নারী সহ মোট ২৪৩ জন ফিলিস্তীনী নিহত হয়েছেন। পক্ষান্তরে হামাসের রকেট হামলায় ইস্রাঈলে নিহত হয়েছে ২ জন শিশু সহ ১২ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে আহত ফিলিস্তীনীদের সংখ্যা ৮ হাযার ৫৩৮ জন।

এদিকে গাযায় ইস্রাঈলী বিমান হামলার বিচার চেয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ফিলিস্তীনের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ শতেয়াহ। তিনি বলেন, গাযায় ইস্রাঈলী বিমান হামলা যুদ্ধাপরাধের শামিল। সেখানে নারী ও শিশুদের গণহত্যা করার অপরাধে ইস্রাঈলকে আন্তর্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এছাড়াও তাদেরকে আসামী করা হবে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এপি ও আল-জাজিরার ১২ তলা ভবন গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

হামলার আগে গত ৩০শে এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় ইস্রাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'-এর প্রধান ইউসি কোহেন এক অনির্ধারিত সফরে ওয়াশিংটন এসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে হোয়াইট হাউজে গোপন বৈঠক করেন। সেখান থেকে সবুজ সংকেত নিয়েই ফিলিস্তীনে বিমান হামলা শুরু হয়। আমেরিকার বিগত প্রেসিডেন্টদের ন্যায় বাইডেনেরও কৈফিয়ত হ'ল 'ইস্রাঈলীদের বাঁচার অধিকার আছে'। কারণ হামাস নিজেদের বাঁচার জন্য ইস্রাঈল অভিমুখে রকেট ছুঁড়ছে। এরই মধ্যে বাইডেন প্রশাসন গত ৫ই মে ইস্রাঈলের নিকট ৭৩৫ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ফিলিস্তীনীদের সমর্থনে ব্যাপক বিক্ষোভ হ'লেও কথিত গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তাতে কোন সাড়া নেই। জার্মানী ও ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দেওয়ায় ১৬ই মে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বৈঠকে চীন বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের কারণেই দীর্ঘ কয়েক দশক ফিলিস্তীন-ইস্রাঈল সংকট নিরসন হচ্ছে না। তারা বলেছে, যেরুযালেমকে ফিলিস্তীনের রাজধানী করে ১৯৬৭ সালের ইস্রাঈল-সিরিয়া যুদ্ধের পূর্বের সীমানা মেনে নিয়ে জাতিসংঘ গৃহীত দ্বি-রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধান অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা হৌক'। ইস্রাঈলের সাবেক যুদ্ধমন্ত্রী লিবারম্যান এই হামলার তীব্র নিন্দা করে বলেন, হামাসের হামলা মুকাবিলায় যদি ইস্রাঈলের এরূপ ছন্নছাড়া অবস্থা হয়, তাহ'লে ইরান ও হিযবুল্লাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে কি হবে? তিনি বলেন, এর ফলে হামাসের বিজয়ের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে'। বিশ্বব্যাপী ফিলিস্তীনীদের প্রতি সমর্থন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পিছন দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, (১) ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তীনে একটি স্বাধীন ইস্রাঈল রাষ্ট্র ঘোষণা দেওয়ার পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান (১৯৪৫-১৯৫৩ খৃ.) ইস্রাঈলকে স্বীকৃতি দেন। (২) ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে হারানো সিরিয়ার গোলান মালভূমি ও মিসরের সিনাই উপত্যকা পুনর্দখলের জন্য ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে মিসর ও সিরিয়ার নেতৃত্বে আরব দেশগুলির সামরিক অভিযানের মুখে ইস্রাঈল যখন কোনঠাসা, তখন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন (১৯৬৯-১৯৭৪) ইস্রাঈলকে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র পাঠিয়ে সাহায্য করেন। (৩) ১৯৮৭-১৯৯১ ফিলিস্তীনীদের 'ইনতেফাদা' দমনে নৃশংস ইস্রাঈলী বাহিনীকে শক্তিশালী করতে রসদ জোগান দেন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান (১৯৮১-১৯৮৯)। (৪) ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তীনীদের দ্বিতীয় ইনতিফাদা দমনের জন্য গাযা ও পশ্চিম তীরে ইস্রাঈলী বিমান হামলা ও স্থল হামলায় সহযোগিতা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ (২০০১-২০০৯)। (৫) ২০০৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর গাযায় ইস্রাঈলীদের চালানো অপারেশন 'কাষ্ট লিড' নামে সেনা অভিযানকে সমর্থন দেন জর্জ বুশ। (৬) ২০১৪ সালের জুলাইয়ে গাযায় ইস্রাঈলের বেপরোয়া বিমান হামলায় সমর্থন ব্যক্ত করেন নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা (২০০৯-২০১৭)। (৭) ২০১৮ সালের মে মাসে গাযার ফিলিস্তীনী বিক্ষোভকারীদের নির্মূল করার জন্য ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে যেকোন ধরনের সমালোচনা নাকচ করে দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (২০১৭-২০২১)। তিনিই প্রথম তার উপদেষ্টা ও ইহূদী জামাতা কুশনারের পরামর্শে ২০১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস তেলআবিব থেকে যেরুযালেমে স্থানান্তরিত করার ঘোষণা দেন। অতঃপর ২০১৮ সালের ১৪ই মে আনুষ্ঠানিকভাবে সেটি বাস্তবায়িত হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ব দ্রুত ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হ'লে উক্ত ঐক্যবদ্ধ শক্তি আমেরিকার কোলে আশ্রিত তথাকথিত ইস্রাঈল রাষ্ট্রটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাবে। অতঃপর সেখানকার ভদ্র নাগরিকরা পূর্বের ন্যায় ইসলামী ফিলিস্তীনের অধীনে বসবাস করবে। যেমনভাবে তারা ইসলামী খেলাফত সমূহের অধীনে শান্তির সাথে বসবাস করে আসছিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, 'ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা পশমের ঘর (অর্থাৎ তাঁবু) বাকী থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছাবেন না, সম্মানী ব্যক্তির ঘরে সম্মানের সাথে এবং অপমানিতের ঘরে অপমানের সাথে। এক্ষণে আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলামের মিল্লাতভুক্ত করে দিবেন। পক্ষান্তরে যাদেরকে তিনি অপমানিত করবেন, তারা (জিযিয়া দানের মাধ্যমে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে'। রাবী মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, (একথা শুনে) আমি বললাম, তখন তো পুরা দ্বীনই আল্লাহ্‌র হয়ে যাবে' (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপরে ইসলাম বিজয়ী হবে) *(আহমাদ হা/২৩৮৬৫; মিশকাত হা/৪২)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

[ইস্রাঈলী হামলার বিরুদ্ধে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইনকিলাবে ১৭ই মে ও ২৩শে মে ২০২১ তারিখে]

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আদব সমূহ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মহান আল্লাহ আদম ও হাওয়া থেকে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন *(নিসা ৪/১)*। সে হিসাবে পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রয়েছে। তবে বিশেষ ভাবে মুসলিম জাতি সৃষ্টি ও আক্বীদাগত উভয় দিক দিয়ে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ ‘মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়’ *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। সুতরাং ভাই ভাই হিসাবে তাদের পারস্পরিক আচরণ কেমন হবে এবং তাদের কিরূপ শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে এ বিষয়ে বিস্তর বিবরণ রয়েছে ইসলামে। যেগুলি পালন করলে ইহকালে জীবন-যাপন যেমন সুন্দর ও সুখময় হবে, তেমনি পরকালে প্রভূত কল্যাণ লাভ করা যাবে। ভ্রাতৃত্বের আদব সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে আলোচনা করা হ’ল।-

১. সদাচরণ করা :

প্রত্যেক মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা মুমিনের কর্তব্য। বিশেষ করে মুসলিম ভাইদের সাথে সদা সুন্দর আচার-ব্যবহার বজায় রাখা যরূরী। আর এটা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশও বটে। আবু যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ- ‘তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, ভাল কাজ মন্দকে দূরীভূত করে দিবে। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর’।[১] একই মর্মে আবুদ দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَا مِنْ شَىْءٍ يُوضَعُ فِى الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ- ‘সচ্চরিত্র ও সদাচারই দাঁড়িপাল্লায় সবচাইতে ভারী হবে। সচ্চরিত্রবান ও সদাচারী ব্যক্তি তার সদাচার ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা অবশ্যই ছায়েম ও মুছল্লীর পর্যায়ে পৌঁছে যায়’।[২]

২. দোষ-ত্রুটি গোপন করা :

মানুষ মাত্রেরই দোষ-ত্রুটি থাকে। মানুষের এ দোষ সংশোধনের জন্য তাকেই বলা উচিত। অন্যথা তা প্রকাশ না করে গোপন রাখা উচিত। কাউকে অপদস্ত করার জন্য তার দোষ জনসমক্ষে প্রকাশ করা আদৌ উচিত নয়। বরং দোষ গোপন রাখাতে অশেষ ছওয়াব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ‘একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন’।[৩]

৩. সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাকে নির্বাচন করা :

বন্ধু নির্বাচনে বা ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে সর্বদা সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত। কেননা প্রত্যেক মানুষের মাঝে তার বন্ধু বা সাথীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ- ‘মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে’।[৪] রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ হচ্ছে মুমিন-মুত্তাক্বীকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা। এ মর্মে অন্য একটি হাদীছে এসেছে, আবূ সাঈদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ- ‘তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন কেবল পরহেযগার লোকে খায়’।[৫]

৪. মন্দদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা :

খারাপ লোকদের থেকে দূরে থাকাই ইসলামের নির্দেশ। যাতে তাদের কোন মন্দ প্রভাব অন্যদের মধ্যে না পড়ে। আল্লাহ বলেন, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ، ‘আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে’ *(মুজাদালাহ ৫৮/২২)*। তিনি আরো বলেন, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا- ‘আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে’ *(কাহফ ১৮/২৮)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ

১. *তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩, সনদ হাসান।*
২. *তিরমিযী হা/২০০৩; ছহীহাহ হা/৮৭৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৭২৬।*
৩. *বুখারী হা/২৪৪২, ৬৯৫১; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮।*
৪. *আবূদাঊদ হা/৪৯৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৫০১৯; ছহীহাহ হা/৯২৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৫৪৫।*
৫. *আবূদাঊদ হা/৪৮৩২; তিরমিযী হা/২৩৯৫; মিশকাত হা/৫০১৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৩৪১।*

إِلَيَّ، ‘আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর’ *(লোক্বমান ৩১/১৫)*।

আর হাদীছে সৎসঙ্গী ও খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে আতর ওয়ালা ও হাফর ওয়ালার সাথে। আবূ মূসা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً– ‘সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হ’ল কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হ’তে তুমি কিছু খরীদ করবে কিংবা তার নিকট হ’তে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে কিংবা তুমি তার নিকট হ’তে দুর্গন্ধ পাবে’।[৬] সুতরাং মন্দদের থেকে দূরে থাকার সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। যাতে তাদের মাধ্যমে ভাল যারা তারা প্রভাবিত হয়ে মন্দ গুণ পরিগ্রহ না করে।

৫. আচার-ব্যবহারে লজ্জাশীলতা বজায় রাখা :

লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ। তাই মুমিনের মাঝে সদা লাজুকতা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তার সকল আচরণে লজ্জার প্রভাব থাকা কর্তব্য। হাদীছে লজ্জাকে ঈমানের বিশেষ শাখা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ– ‘ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হ’ল ‘আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই’- এ ঘোষণা দেওয়া। সর্বনিম্ন শাখা হ’ল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা’।[৭]

৬. হাসি মুখে থাকা :

যারা সর্বদা হাসি-খুশি থাকে তাদেরকে সকলে পসন্দ করে। গম্ভীর হয়ে থাকা মানুষকে অন্যরা পসন্দ করে না। তাছাড়া সদা হাসিমুখে থাকা ও মানুষের সাথে সহাস্য বদনে আচার-ব্যবহার করা ছওয়াব লাভের উপায়। হাদীছে এসেছে, আবূ যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، ‘তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য ছাদাকাস্বরূপ’।[৮] অপর একটি হাদীছে এসেছে, আবু যর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, لاَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ– ‘ভাল কাজের কোনটাকেই তুচ্ছ মনে করবে না। যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎও হয়’।[২১]

৭. ওয়াদা ভঙ্গ না করা :

প্রতিশ্রুতি পূরণ করা ঈমানের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকীর লক্ষণ। আর ওয়াদা ভঙ্গকারীকে কেউ পসন্দ করে না। তাই মুমিনকে সদা ওয়াদা রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ– ‘মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি- ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখা হ’লে খিয়ানত করে’।[৯] সুতরাং মুমিন ভাইয়ের সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করার সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে।

৮. ওযর বা কৈফিয়ত গ্রহণ করা :

মানুষকে আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ করে সৃষ্টি করেননি। প্রত্যেকের কিছু না কিছু অক্ষমতা ও অপারগতা আছে। সুতরাং কারো কোন ক্ষেত্রে ত্রুটি বা কাজে অক্ষমতা পরিলক্ষিত হ’লে সেক্ষেত্রে তার ওযর বা কৈফিয়ত শুনে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কেননা মানুষের ভুল বা অপরাধের ক্ষেত্রে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত। মুগীরাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা’দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) বলেছেন, ... وَلاَ شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَلاَ شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ– ‘...আর মানুষের ওযর-আপত্তি দূর করা আল্লাহ্র চেয়ে অধিক কেউ ভালবাসে না। এ কারণে তিনি মানুষের মাঝে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী নবী-রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন, আর আল্লাহ নিজের প্রশংসা-স্তুতি শুনতে সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন বলে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন’।[১০]

৯. ভাই ও বন্ধুদের প্রয়োজন পূরণ করা :

মানুষের নানা প্রয়োজন থাকে। তাদের চাহিদা পূরণ করা এবং তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা প্রত্যেকের কর্তব্য। আর মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা অন্যতম ছওয়াবের কাজ। যাকে মসজিদে নববীতে মাসাধিককাল ই’তিকাফ করা অপেক্ষা উত্তম বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ

৬. *বুখারী হা/৫৫৩৪, ২১০১; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০১০।*
৭. *বুখারী হা/৯; মুসলিম হা/৩৫; মিশকাত হা/৫।*
৮. *তিরমিযী হা/১৯৫৬; মিশকাত হা/৫০১৮; ছহীহাহ হা/৫৭২।*
৯. *বুখারী হা/৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯; মুসলিম হা/৫৯; মিশকাত হা/৫৫।*
১০. *বুখারী হা/৭৪১৬; মুসলিম হা/১৪৯৯; মিশকাত হা/৩৩০৯।*

دِينًا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الأَقْدَامُ-

‘আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় লোক হ’ল সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী। আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হ’ল, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ করা অথবা তার কোন কষ্ট দূর করে দেওয়া অথবা তার পক্ষ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা দূর করে দেওয়া। এই মসজিদে (নববীতে) একমাস ধরে ই‘তিকাফ করার চাইতে মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ করে নিবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে নিবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নিবে; অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ করে দিবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছলে যাবে’।[১১]

১০. প্রয়োজনের সময় তাদের খেদমত করা :

বিভিন্ন সময়ে মানুষ অপরের মুখাপেক্ষী হয়। যে সময়ে অন্যের সাহায্য ভিন্ন চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তাদের প্রয়োজনের সময় তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা যরূরী। এতে ভ্রাতৃত্ব মযবূত ও স্থায়ী হয়। আর এতে ছওয়াব পাওয়া যায় এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করা যায়। এ মর্মে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ-

‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার বিপদসমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ তা‘আলা তার আখিরাতের বিপদসমূহের মধ্য হ’তে একটি (কঠিন) বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব (সাহায্যের মাধ্যমে) সহজ করে দিবে, আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তা‘আলা এর বিনিময়ে তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোন দল আল্লাহ্‌র কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রশান্তি নাযিল হ’তে থাকে, আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাগণের) নিকট তাদের উল্লেখ করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না’।[১২]

১১. মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণ করার চেষ্টা করা :

পার্থিব ও পরকালীন উভয় দিক দিয়ে মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণ করার চেষ্টা করা। তার অকল্যাণ হয় এমন কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকা যরূরী। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্ষতিগ্রস্ত কর না, ক্ষতিগ্রস্ত হইও না’।[১৩] তাই অন্য ভাইয়ের কল্যাণের চেষ্টা করতে হবে। জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِى بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ. فَقَالَ مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঝাড়ফুঁক করা হ’তে নিষেধ করেছেন। (এ নিষেধের পর) আমর ইবনু হাযম-এর বংশের কয়েকজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কাছে এমন একটি মন্ত্র আছে, যার দ্বারা আমরা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করে থাকি। অথচ আপনি ঝাড়ফুঁক হ’তে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর তারা মন্ত্রটি নবী করীম (ছাঃ)-কে পড়ে শুনাল। তখন তিনি বললেন, আমি এতে দোষের কিছু দেখছি না। অতএব তোমাদের যে কেউ নিজের কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে’।[১৪]

---

১১. *ত্বাবারানী, আল-আওসাত্ব; ছহীহুত তারগীব হা/২৬২৩; ছহীহাহ হা/৯০৬।*

১২. *মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।*

১৩. *ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৫১৭।*

১৪. *মুসলিম হা/২১৯৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৬০১৯; মিশকাত হা/৪৫২৯।*

১২. অসুস্থ হ'লে তাদের দেখতে যাওয়া :

অসুখ-বিসুখ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যা মুমিনের জন্য পরীক্ষা। তাই কোন মুসলিম ভাইয়ের অসুখ হ'লে তাকে দেখতে যাওয়া ও তাকে সান্ত্বনা দেওয়া কর্তব্য। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ– 'এক মুমিনের জন্য আরেক মুমিনের উপর ছয়টি দায়িত্ব রয়েছে, (১) সে অসুস্থ হ'লে তাকে দেখতে যাবে, (২) মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হবে, (৩) ডাকলে তাতে সাড়া দিবে, (৪) দেখা হ'লে তাকে সালাম করবে, (৫) হাঁচি দিলে তার জবাব দিবে এবং (৬) তার অনুপস্থিতি কিংবা উপস্থিতি সকল অবস্থায় তার শুভ কামনা করবে'।[১৫]

১৩. তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা ও তাদের অবস্থা জানা :

ভাই-বোন, সঙ্গী-সাথীদের সাথে মাঝে-মধ্যে সাক্ষাৎ করে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া যরূরী। এতে বহু নেকী রয়েছে এবং এতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ أُرِيْدُ أَخًا لِى فِىْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ أَنِّى أَحْبَبْتُهُ فِىْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ فَإِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ–

'এক ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল। সে আরেক গ্রামে থাকে। আল্লাহ রাস্তায় তার অপেক্ষায় একজন ফেরেশতা বসিয়ে দিলেন। সে যখন সেখানে পৌঁছল, ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যেতে ইচ্ছা করেছ? সে বলল, ঐ গ্রামে আমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে। ফেরেশতা বলল, তার কাছে তোমার কোন পাওনা আছে যে, তুমি তা আনবে? সে বলল, না, আমি শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বলল, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার কাছে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ তোমাকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যেরূপ তুমি তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালবেসেছ'।[১৬] ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَّا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَشُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِّنَ اللهِ. قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرَوْحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلاَ أَمْوَالٍ يَّتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَّإِنَّهُمْ لَعَلَى نُوْرٍ، لاَيَخَافُوْنَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلاَيَحْزَنُوْنَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ–

'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের মর্যাদা দেখে নবী-শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। ছাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বলুন তারা কারা? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা শুধু আল্লাহ্র রূহ (কুরআনের সম্পর্ক) দ্বারা পরস্পরকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন প্রকার আত্মীয়তা নেই এবং তাদের পরস্পরে মাল-সম্পদের লেনদেনও নেই। আল্লাহ্র কসম! তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং তারা উপবিষ্ট হবেন নূরের উপর। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, যখন সমস্ত মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত পড়েন, 'জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না'।[১৭]

১৪. হাদিয়া গ্রহণ করা :

কোন মুসলিম ভাই কোন হাদিয়া বা উপহার প্রদান করলে তা গ্রহণ করা উচিত। আর তা প্রত্যাখ্যান করা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَجِيْبُوا الدَّاعِىَ وَلاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلاَ تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِيْنَ. 'তোমরা দাওয়াত দানকারীর ডাকে সাড়া দাও, উপহারাদি ফেরত দিও না এবং মুসলিমদেরকে প্রহার করো না'।[১৮]

১৫. হাদিয়া প্রদান করা :

মুসলিম ভাইকে মাঝে-মধ্যে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা উচিত। কারণ এতে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পায়। হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, تَهَادُوْا تَحَابُّوْا، 'তোমরা উপহার বিনিময় কর, পারস্পরিক সম্প্রীতি লাভ করবে'।[১৯]

১৬. তাদের সম্মান রক্ষা করা ও তাদের দোষ-ত্রুটি দূর করা :

প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সম্মান-মর্যাদা রয়েছে। তাদের সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করা অপর মুমিনের দায়িত্বের অন্তর্গত। এতে বহু

---

১৫. তিরমিযী হা/২৭৩৭; মিশকাত হা/৪৬৩০; ছহীহাহ হা/৮৩২।
১৬. মুসলিম হা/২৫৬৭; মিশকাত হা/৫০০৭।
১৭. আবূদাঊদ হা/৩৫২৭; মিশকাত হা/৫০১২, ছহীহ লি-গায়রিহি।
১৮. আহমাদ হা/৩৮৩৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৫৭; ইরওয়া হা/১৬১৬; আত-তা'লীকাতুল হিসান হা/৫৫৭৪।
১৯. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪; ইরওয়া হা/১৬০১।

নেকী রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূদ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের মান-সম্মানের উপর আঘাত প্রতিরোধ করে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার মুখমণ্ডল হ'তে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন'।[২০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ، 'যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের গীবত দমন করে তার সম্মান রক্ষা করল, আল্লাহ্র হক হ'ল তিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন'।[২১]

কোন মুসলিম ভাইয়ের মাঝে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'লে তা দূর করার চেষ্টা করা কর্তব্য। কেননা কোন মানুষ নিজের দোষ সহসা অনুধাবন করতে পারে না। সেজন্য অন্যের কাছে সেটা ধরা পড়লে প্রচার না করে, তা সংশোধনের চেষ্টা করা যরূরী। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ– 'এক মুমিন অপর মুমিনের দর্পণ এবং এক মুমিন অপর মমিনের ভাই'।[২২]

১৭. তাদের দোষ গোপণ করা এবং গুণ প্রকাশ করা :

কথায় বলে, দোষে-গুণে মানুষ। প্রতিটি মানুষের যেমন কিছু দোষ থাকতে পারে, তেমনি তাদের কোন না কোন গুণও অবশ্যই আছে। সুতরাং মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রেখে তার গুণ প্রকাশ করা উচিত। কারণ প্রত্যেকেই তার দোষ প্রকাশ হওয়া ও গুণ প্রচার হওয়াকে পসন্দ করে। অতএব মানুষ নিজের জন্য যা পসন্দ করে, অন্য ভাইয়ের জন্যও তাই পসন্দ করবে। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ– 'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পসন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পসন্দ করে'।[২৩]

১৮. তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করা ও রাগ না করা :

মানুষের সাথে চলাফেরায় অনেক সময় তাদের কোন আচরণে মনে কষ্ট হ'তে পারে। মুসলিম ভাইয়ের দেওয়া এই কষ্টে ধৈর্যধারণ করা উচিত। এতে অনেক ছওয়াব রয়েছে। ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ الَّذِى يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ– 'যে মুমিন মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে সে ঐ মুমিন অপেক্ষা অধিক নেকীর অধিকারী হয়, যে জনগণের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণ করে না'।[২৪]

মুসলিম ভাইয়ের কোন ব্যবহারে কষ্ট পেলেও রাগ না করে ধৈর্য ধারণ করা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এমর্মে হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রাহ হ'তে বর্ণিত, أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِى قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لاَ تَغْضَبْ– 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বলল, আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না। লোকটি কয়েকবার তা বললে নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক বারেই বললেন, রাগ করো না'।[২৫]

১৯. তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য দো'আ করা :

মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দো'আ করা। এতে প্রার্থনাকারীর জন্য ফেরেশতাগণ অনুরূপ দো'আ করে থাকেন। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, ছাফওয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে ছাফওয়ান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدِمْتُ الشَّامَ فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِى مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَتْ فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ–

'আমি সিরিয়াতে আবুদ দারদা (রাঃ)-এর ঘরে গেলাম। আমি তাকে পেলাম না; বরং সেখানে উম্মুদ দারদাকে পেলাম। তিনি বললেন, আপনি কি এ বছর হজ্জ পালন করবেন? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্র নিকট আমাদের কল্যাণের জন্যে দো'আ করবেন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলতেন, একজন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো'আ করলে তা কবুল হয়। তার মাথার নিকটে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, যখন সে তার ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করে তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলে থাকে, 'আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ হোক'।[২৬]

২০. তাদের প্রতি বিনয়ী হওয়া ও তাদের সাথে অহংকার না করা :

বিনয়-নম্রতা মুমিন চরিত্রের ভূষণ। সবার সাথে এই নম্র আচরণ বজায় রাখা কর্তব্য। আর গর্ব-অহংকার সর্বদা

২০. *তিরমিযী হা/১৯৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬২৬২; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৪৮।*

২১. *আহমাদ হা/২৭৬০৯; ছহীহুল জামে' হা/৬২৪০; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৪৭-৪৮।*

২২. *আবূদাঊদ হা/৪৯১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯২৬, হাদীছ হাসান।*

২৩. *বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫।*

২৪. *তিরমিযী হা/২৫০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৩২; মিশকাত হা/৫০৮৭; ছহীহাহ হা/৯৩৯।*

২৫. *বুখারী হা/৬১১৬।*

২৬. *মুসলিম হা/২৭৩৩; ছহীহাহ হা/১৩৩৯।*

পরিত্যাজ্য। কারো সাথে অহংকারী আচরণ করা সমীচীন নয়। নম্র-ভদ্র আচরণ ও শালীন ব্যবহার মানুষকে অন্যের কাছে প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তাই ইসলামে নম্র আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীছে এসেছে, ইয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ- 'মহান আল্লাহ আমার নিকট (এ মর্মে) অহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, যতক্ষণ না একে অপরের উপর যুলুম করে এবং অহংকার করে'।[২৭]

২১. তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা :

প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু গোপনীয় বিষয় থাকে। তাই মুসলিম ভাইয়ের কোন গোপন বিষয় অবগত হ'লে তা গোপন রাখা কর্তব্য। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ أَمَانَةٌ- 'কোন ব্যক্তি কোন কথা বলার পর মুখ ঘুরালে (অন্য কেউ শুনছে কি-না তা লক্ষ্য করলে) তা আমানত স্বরূপ'।[২৮]

২২. তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান করা :

বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম ভাইকে উপদেশ দেওয়া উচিত। যাতে তার ত্রুটি সংশোধিত হয় এবং সে ইবাদতের কাজে উৎসাহিত হয়। এমর্মে হাদীছে এসেছে, তামীম আদ-দারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ- 'দ্বীন হচ্ছে উপদেশ দানের নাম। আমরা আরয করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূল, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের জন্য'।[২৯]

২৩. তাদের প্রতি সহমর্মী হওয়া :

ভ্রাতৃত্বের মযবূত বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিম ভাইয়ের সুখে যেমন আনন্দিত হওয়া উচিত, তেমিন তার দুঃখে ব্যথিত হওয়া এবং তাকে সান্ত্বনা প্রদান করা কর্তব্য। এ মর্মে আবূ মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. 'এক মুমিন আপর মুমিনের জন্যে প্রাচীর, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এই বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো একটার মধ্যে আরেকটা প্রবেশ করালেন'।[৩০]

২৭. মুসলিম হা/২৮৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৮৯৫।
২৮. আবুদাঊদ হা/৪৮৬৮; তিরমিযী হা/১৯৫৯; ছহীহাহ হা/১০৮৯।
২৯. মুসলিম হা/৫৫; নাসাঈ হা/৪১৯৭; মিশকাত হা/৪৯৬৬।
৩০. বুখারী হা/৪৮১, ৬০২৬; মুসলিম হা/২৫৮৫; মিশকাত হা/৪৯৫৫।

২৪. তাদেরকে পরিত্যাগ না করা :

কোন কারণে মুসলিম ভাইয়ের সাথে মনোমালিন্য হ'লেও তাকে পরিত্যাগ করা বা তার সাথে কথা-বার্তা ও দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। আবূ আইউব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ- 'কোন লোকের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দু'জনে দেখা হ'লেও একজন এদিকে আরেকজন ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখবে। তাদের মধ্যে যে আগে সালাম দিবে, সেই উত্তম'।[৩১]

২৫. তাদের ব্যাপারে অন্যের গীবত-তোহমত ও চোগলখুরী না শোনা :

মুসলিম ভাইয়ের দোষ অন্যের কাছে প্রকাশ করা থেকে যেমন বিরত থাকতে হবে, তেমনি কোথাও কোন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হ'লে তা বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা তা শ্রবণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে সাহল ইবনু মু'আয ইবনু আনাস আল-জুহানী (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ. بَعَثَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَىْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ-

'যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিক থেকে রক্ষা করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার শরীর জাহান্নাম থেকে রক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে দোষারোপ করবে, তাকে মহান আল্লাহ জাহান্নামের সেতুর উপর প্রতিরোধ ব্যবস্থা করবেন যতক্ষণ না তার কৃতকর্মের ক্ষতিপূরণ হয়'।[৩২]

উপসংহার :

পৃথিবীতে সকল মানুষ ভাই ভাই হিসাবে মিলেমিশে বসবাস করতে পারলে এবং পারস্পরিক শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারলে সমাজ সুন্দর হবে। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং অনাচার-অবিচার, অস্থিতিশীলতা দূরীভূত হবে। সকলের জীবন যাত্রা হবে নিরাপদ। কেউ কারো হক নষ্ট করতে প্রবৃত্ত হবে না। বরং একে অন্যের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবে। পরকালীন জীবনেও তেমনি অশেষ ছওয়াব লাভ করা যাবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভ্রাতৃত্বের আদব সমূহ পালনের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

৩১. বুখারী হা/৬০৭৭, ৬২৩৭; মুসলিম হা/২৫৬০।
৩২. আবুদাঊদ হা/৪৮৮৩; মিশকাত হা/৪৯৮৬, সনদ হাসান।

www.at-tahreek.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, বাংলা বাজার, ০১৭৮৪-০১২৯৬৪।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা, পতেঙ্গা, ০১৭৩৫-৩৩৭৯৭৬।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা** : ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

নীলফামারী : এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট** : শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ** : আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।

ঝিনাইদহ : আসাদুল্লাহ কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার, ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।

চুয়াডাঙ্গা : সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা, ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা, ০১৭১৮-১২০৩১৫।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮।

গাইবান্ধা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম, ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২।

লালমণিরহাট : শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

বগুড়া : শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪৯-৭৪০২৮৩; আল-মমীনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মমীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

সিরাজগঞ্জ : মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর, ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রূহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে, ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।

জয়পুরহাট : আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; জিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। রহমানিয়া লাইব্রেরী, চকদেব ডাঃ পাড়া ০১৭৪০-৪১৫৫৮৩।

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০২১ ২৪তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

জিহাদ আন্দোলন : আহলেহাদীছ জামা'আত ও হানাফী আলেমগণ

*মূল (উর্দূ): হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

ভূমিকা :

দারুল উলূম দেওবন্দ ও তথাকার শিক্ষাপ্রাপ্ত মনীষীদের ইলমী ও দ্বীনী খিদমত পাকভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রতিষ্ঠানটির জন্মলগ্ন থেকে নিজেদের ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উপরোক্ত ক্ষেত্রে তাঁরা যে কাজ করে চলেছেন মতপার্থক্য সত্ত্বেও তা অস্বীকারের কোন উপায় নেই। কিন্তু শিক্ষণ-শিখন, পঠন-পাঠন, তাবলীগী প্রচার কার্য ও বই-পুস্তক লেখালেখি এক জগৎ আর জাতীয় ও রাজনৈতিক খিদমত ভিন্ন জগৎ। এটা আবশ্যক নয় যে, শিক্ষণ-শিখন, পঠন-পাঠন, তাবলীগ বা প্রচার ও বই-পুস্তক লেখালেখির সঙ্গে জড়িত লোকেরা রাজনীতির ময়দানেরও বীরকেশরী হবেন।

একইভাবে প্রথমোক্ত দলের খিদমতের গুরুত্বও এ কথার উপর সীমাবদ্ধ নয় যে, পরে উল্লেখিত দলের খিদমতের সাথে তাদের কোন না কোন সংযোগ অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু এ কথা খুবই আফসোসের যে, দেওবন্দী ঘরানার ব্যক্তিরা নিজেদের সম্মানিত ও মহান ব্যক্তিবর্গের জীবনী ও অবদান আলোচনাকালে এই ভুলটাই করেছেন। তারা ধরে নিয়েছেন যে, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদেরকে রাজনীতির ময়দানের বীরপুরুষ (সোহরাব-রুস্তম) না প্রমাণ করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে না। চিন্তার এই বক্রতা তাদেরকে নিজেদের বুযর্গদের রাজনৈতিক ভূমিকার একটি চিত্র দাঁড় করাতে বাধ্য করেছে, চাই তা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হোক বা না হোক। এজন্য তারা প্রকৃত ইতিহাস লেখার পরিবর্তে মনগড়া ইতিহাস তৈরির পথ বেছে নিয়েছেন। সে ইতিহাস তৈরিতে তারা নিম্নের বিষয়গুলো সবার দৃষ্টিগোচর করার প্রয়াস পেয়েছেন।

১. তারা দেওবন্দী চিন্তাধারাকে ওয়ালিউল্লাহ চিন্তাধারার উত্তরসূরী হিসাবে খাড়া করেছেন। কেননা শাহ অলিউল্লাহ পরিবারের বিদ্যাচর্চা-শিক্ষাদান, সংস্কার প্রচেষ্টা, শুদ্ধি আন্দোলন এবং পরবর্তীতে জিহাদী খিদমত একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। অথচ শাহ অলিউল্লাহ ও তাঁর শিক্ষা পরিবার পাকভারতীয় উপমহাদেশে যেভাবে হাদীছের প্রসার ঘটিয়েছেন এবং ফিক্বহী জড়তা দূরীভূত করেছেন, তার সাথে দেওবন্দী চিন্তা-চেতনার কোনই সম্পর্ক নেই। তাদের চিন্তা ও কর্ম অলিউল্লাহ্র চিন্তা ও কর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বরং শাহ অলিউল্লাহ্র চিন্তা-চেষ্টার ধারাবাহিকতা পাকভারতীয় উপমহাদেশে যদি কেউ কায়েম রেখে থাকেন তবে তারা হলেন আহলেহাদীছ। শাহ আব্দুল আযীযের মসনদে সমাসীন শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.)-এর হিজরতের পর অলিউল্লাহ মসনদের উত্তরাধিকারী হন হযরত শায়খুল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহ.)। যিনি অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময় ধরে এই আসনে সমাসীন থেকে হাদীছের দারস প্রদান করেন। তাঁর ছাত্ররা সারা হিন্দুস্তানে কুরআন ও হাদীছের আওয়ায বুলন্দ করেছেন। যার ফলে ফিক্বহী জড়তা কেটে গিয়ে তাক্বলীদের বন্ধন শিথিল হ'তে থাকে এবং কুরআন ও হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা ব্যাপক হ'তে থাকে। যেমনটা মাওলানা সুলাইমান নাদভী ইমাম খান নওশাহরা রচিত 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' (হিন্দুস্তানের হাদীছ চর্চাকারী আলেমদের জীবনকথা) গ্রন্থের ভূমিকায় এ কথা স্বীকার করেছেন।

দেওবন্দীদের এখানে ইতিহাস বানানোর ধরন এই যে, তারা শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলভী (রহ.) কর্তৃক কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার বিষয়টা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান এবং হযরত মিয়াঁ ছাহেব (কাদ্দাসাল্লাহু রুহাহু) যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন সে কথা হয় একেবারেই উল্লেখ করেন না অথবা উল্লেখ করলেও এমন ধারায় করেন যে, তাতে কথার মোড় খুব সহজেই দেওবন্দী ধারার দিকে ফিরে যায়। তারপর তারা দেওবন্দী বুযুর্গদেরকে এই মসনদের সঙ্গে যুক্ত করে তাদেরকে অলিউল্লাহ চিন্তাধারার ওয়ারিছ সাব্যস্ত করেন, যা বাস্তবতার একেবারেই বিপরীত। এই আলোচ্য বিষয় যেহেতু কিছুটা ভিন্নধর্মী তাই এখানে তার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তাদের মনগড়া ইতিহাস তৈরির আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে কথাগুলো কলমের ডগায় এসে গেল।

২. তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে শামেলীর ঘটনা ও রেশমী রুমাল আন্দোলনের কথা খুব জোরেশোরে প্রচার করেন এবং জিহাদ আন্দোলনের সাথে তার একটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। অথচ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর জিহাদ আন্দোলন দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার বেশ কিছুকাল আগের কথা। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বালাকোটের মর্মান্তিক জিহাদ সংঘটিত হয়েছিল। তাতে দুই মহান নেতাই শাহাদাতের পিয়ালা পান করেছিলেন। এটি ছিল জিহাদ আন্দোলনের প্রথম যুগ। তাঁদের শাহাদাতের পর ছাদেকপুরের আলেমগণ পূর্ণ সততা, দৃঢ়তা ও স্থৈর্যের সাথে জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং প্রায় একশ' বছর এ পথে নযীরবিহীন কুরবানী বা অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করেন। এটা শুধু পাক ভারত উপমহাদেশের জিহাদ আন্দোলনের ইতিহাসের নয়; বরং ইসলামের ইতিহাসেরও একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল অধ্যায়। এই জিহাদ আন্দোলনে যেহেতু দেওবন্দের বুযুর্গদের কোথাও নাম আসে না, তাই দেওবন্দী ঘরানার লেখকেরা ১৮৫৭ সালের শামেলীর একটি ঘটনাকে বাড়িয়ে-চড়িয়ে উপস্থাপন করে থাকেন এবং তাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা বিশাল যুদ্ধ হিসাবে প্রতীয়মান করতে চান। তার অর্ধ শতাব্দী পরে আরেকটি আন্দোলন যা 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' নামে

** পাকিস্তানের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, লেখক ও গবেষক; সাবেক সম্পাদক, আল-ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান।*

*** ঝিনাইদহ।*

www.at-tahreek.com

পরিচিত, তারা তারও খুব প্রচার-প্রপাগাণ্ডা করে থাকেন। তাদের এসব কিছু করার মূল উদ্দেশ্য, দেওবন্দের বুযুর্গদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরপুরুষ বানানো। অথচ শামেলীর ঘটনা ও 'রেশমী রুমাল আন্দোলনে'র উদ্দেশ্য ও বিস্তারিত বর্ণনা যা দেওবন্দী লেখকেরা যাহির করে থাকেন বাস্তব ঘটনা ও সত্যতা তাদের সাপোর্ট করে না। প্রিয় পাঠক, এ গ্রন্থে তার আবশ্যকীয় বর্ণনা আপনি পড়তে পাবেন।

৩. একই ধারায় দেওবন্দী ঘরানার লেখকরা এটাও প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন যে, ছাদেকপুরের আলেমরা ছিলেন হানাফী। এভাবে জিহাদ আন্দোলনের অনেক কৃতিত্ব আপনা থেকেই হানাফীদের ভাগে এসে পড়ে। অথচ এ দাবী একেবারেই বাস্তবতা বিরোধী। তার বিবরণও সামনে আসছে।

৪. আহলেহাদীছদের ইংরেজ ভক্ত প্রমাণ করা ছিল তাদের আরেকটা কদর্য চেষ্টা। এমনটা হ'লে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চেষ্টা-সংগ্রামে দেওবন্দের বুযুর্গদের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা যাবে। অথচ এ কথাও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ কথা ঠিক যে, আহলেহাদীছ আলেমদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী (রহ.) নানা কারণে ইংরেজের আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন এবং একইভাবে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানও নিজের রাজ্য রক্ষা ও পদ-পদবীর বাধ্যবাধকতায় এ ধরনের আনুগত্যমূলক কথা বলেছেন, কিন্তু তার সাথে এটাও সত্য যে, আহলেহাদীছ আলেমদের একটি বিরাট অংশ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ীরা জিহাদ আন্দোলনে খুবই তৎপরতার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। আর ছাদেকপুরী পরিবার যারা ছিলেন হাদীছের উপর আমলকারী তারা ছিলেন এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। যেই আহলেহাদীছরা কিনা শত বছরের বেশী সময় ধরে জিহাদের পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন সেই আহলেহাদীছদের গোটা জামা'আতকে মাওলানা বাটালভী ও নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের কার্যক্রমের ভিত্তিতে ইংরেজভক্ত প্রমাণের চেষ্টা নেহায়েত অসমীচীন ও বেআইনি। কিন্তু দেওবন্দী ঘরানার লেখকরা এই কাজটাই করে চলেছেন।

৫. আহলেহাদীছের বিপরীতে কিছু হানাফী ব্যক্তিগতভাবে যদিও জিহাদ আন্দোলনে শরীক ছিলেন, কিন্তু হানাফীদের বিশেষ করে দেওবন্দের আলেমগণের গোষ্ঠী ধরে জিহাদ আন্দোলনে শরীক হওয়া ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। কিন্তু দেওবন্দী লেখকরা দেওবন্দের মনীষীদের জিহাদ আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের হিরো বানানোর চেষ্টায় কোন কসুর করেন না। অথচ সত্য ঘটনা এই যে, জিহাদ আন্দোলনে তাদের মোটেও কোন ভূমিকা ছিল না। তবে দেশ মুক্তির আন্দোলনসমূহে তাঁরা শরীক ছিলেন। কিন্তু সেসব আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ মাওলানা মাহমূদুল হাসানের মাল্টা থেকে মুক্তি লাভের পর ঘটেছিল। আর এটা এমন সময় ঘটেছিল যখন সকল আন্দোলনই ব্যাপকতা লাভ করেছিল এবং ধর্ম, মত নির্বিশেষে দেশের সকল স্তরের মানুষ তাতে শরীক হচ্ছিল। তখনও কিন্তু আহলেহাদীছ ও ছাদেকপুরবাসীরা ইংরেজদের বিরোধিতায় সম্মুখসারিতে ছিলেন। শুরেশ কাশ্মীরী বলেন :

ھم نے اُس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا
جب سیاست کا صلہ آھنی زنجیریں تھیں
سرفروشوں کے یے دارورسن قائم تھے!
خان زادوں کے یے مفت کی جاگیریں تھیں
بے گناھوں کا لھو عام تھا بازاروں میں
خورن احراریں ڈوبی ھوئی شمشیریں تھیں
از اُفق تا بہ اُفق خوف کا سناٹا تھا
رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں

আমরা সে সময় রাজনীতির মাঠে পা রেখেছিলাম যে সময় রাজনীতির প্রতিদানে মিলত লৌহ শিকল। যারা ছিলেন জীবন উৎসর্গকারী তাদের জন্য তৈরি থাকত ফাঁসির রশি কিন্তু শাহজাদাদের মিলত ফ্রি জায়গীর। নিরপরাধদের রক্ত বাজারে ছিল সস্তা তলোয়ার ডুবে ছিল স্বাধীনচেতাদের রক্তে। দিগন্তের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত ত্রাস ছেয়েছিল, রাতের কয়েদখানায় বন্দী ছিল সূর্যরশ্মি।

৬. ইংরেজ গবেষক ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হিন্দুস্তানের যে দলটি সবচেয়ে বেশী তৎপর ছিল তারা হ'ল 'ওহাবী'। এমনকি 'ওহাবী'কে বিদ্রোহীর সমার্থক ভাবা হ'ত। দেওবন্দী লেখকরা এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন যে, এখানে 'ওহাবী' দ্বারা আহলে হাদীছদের বুঝানো হয়নি, বরং তাদের বুঝানো হয়েছে, যারা জিহাদ আন্দোলনে শরীক এবং ইংরেজ সরকারের বিরোধিতায় অগ্রণী ছিলেন। এ কথা ঠিক যে, কিছু ঐতিহাসিকের বর্ণনায় 'ওহাবী' বলতে উল্লেখিতদেরই নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, তাদের ওহাবী বলার হেতু কী? তার কারণ এটাই যে, ঐ মুজাহিদরা আক্বীদা ও আমলের দিক দিয়ে ওহাবী অর্থাৎ আহলেহাদীছই ছিলেন। আন্দোলনের নেতৃত্বও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের হাতে ছিল এবং এতে অংশগ্রহণকারী সাধারণ জনগণও এই হক দলের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। অবশ্য স্বল্প সংখ্যক হানাফীও এই দলে শরীক ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদের প্রভাবশালী ও উল্লেখযোগ্য বড় একটা সংখ্যা ছিলেন আহলেহাদীছদের আলেম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সেহেতু এই জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের নাম দেওয়া হয় 'ওহাবী'। এ জন্যে ওহাবী বলতে আহলেহাদীছদেরই বুঝানো হয়েছে; না হানাফীদেরকে, না হানাফী-আহলেহাদীছ উভয়কে।

এর বিস্তারিত আলোচনা আপনি এ গ্রন্থে দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

৭. দেওবন্দীগণ আরেকটি যুলুম করে চলছেন যে, স্বাধীনতা হাছিলে যেসব আন্দোলনে আহলেহাদীছ ও দেওবন্দের

মান্যবরগণ শরীক থেকেছেন সে সকল আন্দোলনের আলোচনাকালে তারা কেবল দেওবন্দী আলেমদের কার্যাবলী স্পষ্ট করে আলোচনা করেন, আহলেহাদীছ আলেমদের খিদমত ও কার্যাবলী সাধারণত পুরোপুরি এড়িয়ে যান। অথচ ইতিহাস লেখায় এ ধরনের দলীয় সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্ব কোন দিক দিয়েই ভালো নয়। যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় থেকে এ কথার বিবরণ কিছুটা ভিন্নধর্মী তাই এ সময়ে এ আলোচনা সমীচীন হবে না।

মোটকথা, এই লাইন বা রেখা ধরে দেওবন্দীগণ নিজেদের ইতিহাস তৈরির ভিত্তি মযবুত করেছেন। এখন এই লাইনের আলোকে ইতিহাসের নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ছহীহ-শুদ্ধ ও প্রকৃত ঘটনা সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন, যাতে দেওবন্দীদের ইমিটেশনকৃত ইতিহাসের পর্দা বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং যে সকল কাজের উপর পর্দা আরোপের চেষ্টা করা হয়েছে, অথবা বিস্মৃতির অতলান্তে তলিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আবার আলোর সামনে তুলে ধরা যায় এবং ইতিহাসের কমনীয় ধারা এমন আলোকিত ও উজ্জ্বল করে তোলা যায় যাতে ইতিহাসের প্রতিটি কাজ নিজ নিজ হক অনুযায়ী সম্মান ও গুরুত্ব লাভ করে। না কাউকে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হবে, না কাউকে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে উপরে তুলে ধরা হবে। সীমা ছাড়া মর্যাদা দান কিংবা প্রাপ্য মর্যাদা দানে কার্পণ্যতার সিলসিলা যেন বন্ধ হয়ে যায় যা দেওবন্দের ছোট বড় সকল শ্রেণীর লেখক করে চলেছেন।

উপরের আলোচনায় তাদের এহেন কারসাজির উপরই আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থ অবশ্য পুরোপুরি উল্লেখিত দৃষ্টিকোণের আলোকে লেখা হয়নি। কেননা এজন্য যতটা অবকাশ ও শ্রমদান প্রয়োজন নানান ব্যস্ততায় তা হয়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও আগেকার কিছু বাক্যে এর একটা স্কেচ আঁকা হয়েছে এই আশায় যে, সম্ভবত কোন জানাশোনা লোক তাতে রং-তুলি চড়াবে এবং ইতিহাসের এই শূন্যতাকে পূরণ করবে। লেখকের এ গ্রন্থ তো আসলে ছিল একটা প্রবন্ধ, যা আজ থেকে ১২-১৩ বছর আগে এক দেওবন্দী প্রফেসরের জবাবে লেখা হয়েছিল; যিনি কি-না একটি দুর্ঘটনায় ইন্তিকাল করেছেন। (রাহিমাহুল্লাহু ওয়া গাফারা লাহু)। উক্ত প্রফেসর ছাহেব মনগড়া ইতিহাস রচনার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা ও ছাদেকপুরী পরিবারের কার্যাবলী বিকৃত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তার কয়েক কিস্তি 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তখন লেখকের এক গুণী বন্ধু মাওলানা আবদুল খালেক কুদ্দূসীও (মাকতাবায়ে কুদ্দূসিয়া, উর্দূ বাজার, লাহোর-এর মালিক) উল্লেখিত প্রফেসরের জবাবে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। ফলে লেখক তার লেখা বন্ধ রাখেন।

তখন থেকে এভাবে প্রবন্ধটি অপূর্ণ পড়ে থাকে। আশা ছিল যে, এই অনভিপ্রেত আলোচনা সাধারণের গোচরে হয়তো পুনর্বার আনার প্রয়োজন পড়বে না। এজন্য এ লেখক তার প্রবন্ধের কথা মাথা থেকে বিলকুল ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উক্ত প্রফেসর ক্ষুদ্রাকারে যে আলোচনার সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন দেওবন্দী লেখকরা তা ব্যাপকভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখতে শুরু করেন এবং অনবরত এ বিষয়ে উত্তেজনাকর কথাবার্তা বলে চলেন। বিগত কয়েক বছরে দেওবন্দী দোস্তদের পক্ষ থেকে পূর্বে বর্ণিত নিশানার ভিত্তিতে এমন উত্তেজনাকর লেখা সামনে এসেছে যা পড়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে।

দেওবন্দী লেখকরা যে আহলেহাদীছ জামা'আতকে ইংরেজ প্রভুর সেবাদাস প্রমাণের কোশেশ করছিলেন এবং তাদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে চলছিলেন তার স্বরূপ উন্মোচন ও তা প্রতিহত করার জন্য আমার কিছু দোস্ত-বন্ধুও আমাকে কলম ধরতে খুব পীড়াপীড়ি করেন।

যেমনটা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, সময়-সুযোগের অভাবে এ লেখকের পক্ষে আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত লেখা সম্ভব হয়নি। তবুও مَا لاَيُدْرَكُ كُلُّهُ لاَيُتْرَكُ كُلُّهُ 'যার পুরোটা আয়ত্বে আসছে না, তার পুরোটাই ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না' প্রবাদ সূত্রে চিন্তা করলাম যে, ফিলহাল বিস্তারিত না হ'লেও সংক্ষিপ্ত আকারে তাদের দাবীর অসত্যতা প্রকাশ করি। ভবিষ্যতে কোন সময় এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিস্তারিত লেখার সুযোগ সৃষ্টি হ'তে পারে। لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا 'হয়তো ভবিষ্যতে আল্লাহ কোন উপায় বের করে দিবেন' *(ত্বালাক ৬৫/১)*।

তাই এ লেখক বিভিন্ন সময়ে তার উল্লেখিত প্রবন্ধের কিছুটা পূর্ণতা দিয়েছে। যদিও আলোচনার আরও অনেক দিক এখনও বাকী আছে তবুও আশা করি যে, এই অপূর্ণ রচনাও আল্লাহ চাহেন তো দেওবন্দীদের দাবীগুলোর জট খুলতে মুখ্য চাবির ভূমিকা পালন করবে।

এ রচনা দ্বারা নিশ্চিতই গবেষণার নতুন একটি রাস্তা খুলবে, অনেক সত্য উন্মোচিত হবে। মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার ফলে জমে ওঠা মোটা দাগের আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আহলেহাদীছদের উপর যুলুমের কিছুটা প্রতিকার হবে। লেখক এই অপূর্ণ রচনা দ্বারা এখনকার মতো اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا 'তোমার ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে যালেম হোক কিংবা মাযলূম' *(বুখারী হা/২৪৪৩; মিশকাত হা/৪৯৫৭)*-এর উপর আমল করে নিপীড়িত আহলেহাদীছদের হেফাযত ও প্রতিরক্ষার ভূমিকা পালন করেছে। সেই সঙ্গে যালেমকেও তার যুলুম সম্পর্কে অবহিত করে আগামীতে তাকে যুলুম ও অবৈধ আক্রমণ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছে। আল্লাহ করুন, যালেম গোষ্ঠী যেন তাদের যুলুম থেকে সরে আসে-যাতে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কলম ধরার আর কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়। وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ 'আর সেটা আল্লাহ্‌র জন্য মোটেই কঠিন নয়' *(ইবরাহীম ১৪/২০)*।

[ক্রমশঃ]

নববী চিকিৎসা পদ্ধতি

-ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী*

(৩য় কিস্তি)

বেশী বেশী ওযূ করা :

আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত জীবন বিধান সার্বজনীন, শাশ্বত ও কল্যাণকামী। অনুরূপ একটি বিধান হ'ল ওযূ। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত ও কা'বা ঘর তওয়াফের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল পবিত্রতা তথা ওযূ করা।[১] ওযূর সময় উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করতে হয়, গড়গড়ার সাথে কুলি করতে হয় এবং সেই সাথে নাকে পানি প্রবেশ করিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয়। অতঃপর সমস্ত মুখমণ্ডল উত্তমরূপে ধৌত করতে হয়; ভালোভাবে মাথা ও কান মাসাহ করতে হয় এবং সবশেষে উভয় পা উত্তমরূপে ধৌত করতে হয়। যাতে সামান্যতম অংশও শুকনা না থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনটিই নির্দেশ দিয়েছেন।[২] এমনকি তীব্র শীত ও অসুস্থতার সময় বা পানি সংকটের সময়ও উত্তমরূপে ওযূ করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ 'আমি কি তোমাদের এমন একটি কথা বলব না আল্লাহ তা'আলা যা দিয়ে তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং (জান্নাতেও) পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন? ছাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন তিনি বললেন, কষ্ট হ'লেও পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ রাখা এবং এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পর অপর ওয়াক্ত ছালাতের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হ'ল 'রিবাত্ব' (প্রস্তুতি গ্রহণ)।[৩]

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ওযূতে যেসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করতে হয়, সেগুলো হ'ল রোগজীবাণুর প্রবেশ দ্বার এবং রোগবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের প্রধান মাধ্যম। রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে রাখার সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি এটাই। ওযূ মানবদেহে রোগজীবাণু প্রবেশে বাধা প্রদানে অতন্দ্র প্রহরী।

ওযূর সময় সর্বপ্রথম উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতে হয়। দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশের প্রধান মাধ্যম যে হাত তা বিশ্ববাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল এ করোনার সময়ে। কেননা হাত দ্বারাই অধিকাংশ কাজ-কর্ম সম্পাদন করতে হয়। যে কারণে হাতেই সর্বপ্রথম রোগজীবাণু লেগে যায় এবং তা উত্তমরূপে ধৌত না করে খাবার খেলে, নাক, মুখ বা চোখ স্পর্শ করলে তা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে জন্ম দেয় অসংখ্য রোগব্যাধি। শুধু জাগ্রত অবস্থায়ই নয়, ঘুমের মাঝে অচেতন অবস্থায়ও হাতে লেগে যেতে পারে রোগজীবাণু ও অপবিত্রতা। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুম থেকে উঠে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ভালোভাবে ধৌত না করে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন সে যেন স্বীয় হাত পানির পাত্রে না ডুবায়, যে পর্যন্ত না তা তিনবার ধুয়ে নেয়'।[৪]

ওযূর মাধ্যমে হস্তসমূহ পরিস্কার না করলে নিম্ন বর্ণিত রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (ক) চর্মরোগ (খ) ঘামাচি (গ) চর্মের জ্বালা-যন্ত্রণা (ঘ) ফ্যাঙ্গাশ ইত্যাদি।[৫]

আমরা যখন আহার করি, তখন খাবারের ছোট ছোট কণা দাঁতের ফাঁকে আটকে থেকে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে এবং থুথুর সাহায্যে তা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। আর ঐ দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ ক্ষতি সাধন করে দন্ত ও মাড়ির। কুলি ও মিসওয়াক দ্বারা এ থেকে মুক্ত থাকা যায়। বাতাসে অসংখ্য ধ্বংসাত্মক রোগজীবাণু উড়ে বেড়ায়। আমরা তা খালি চোখে দেখতে পাই না। অথচ সেই রোগজীবাণু বাতাসের সাহায্যে আমাদের মুখের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে এবং থুথুর সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। সেগুলোকে পরিচ্ছন্ন না করলে নিম্নবর্ণিত রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(১) মুখ পাকা (যা এইডসের প্রাথমিক লক্ষণ) মুখের কিনারা ফেটে যাওয়া, মুখে দাদ হওয়া, মুখে ছেতো রোগ হওয়া ইত্যাদি। মোটকথা কুলি করা এমনই একটি আমল, যার দ্বারা মানুষ এমন রোগ থেকে মুক্তি পায়। ঐ রোগ হ'লে মানুষের দ্বীন-দুনিয়া উভয়ই বরবাদ হয়ে যায়। তদুপরি কুলির মধ্যে গড়গড়া করা, যা দ্বারা মুছল্লী টনসিল ও গলার বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পায়। এমনকি বার বার গলায় পানি পৌঁছানো গলাকে ক্যানসার থেকেও রক্ষা করে।[৬]

(২) শ্বাস গ্রহণের একমাত্র পথ হ'ল নাক। আর যেই বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে লালিত-পালিত হয় অসংখ্য রোগজীবাণু, যা নাকের ভিতর দিয়ে অতি সহজেই মানবদেহে প্রবেশ করে। সুতরাং এ রোগজীবাণু মিশ্রিত ধুলোবালি সর্বদা শ্বাসের সাহায্যে নাকের মধ্যে প্রবেশ করছে। এভাবে যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করতেই থাকে, তাহ'লে বিপদজনক রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবল আকার ধারণ করে। তাই স্থায়ী সর্দি-কাশি ও নাকের রোগীদের জন্য নাক ধৌত করা খুবই উপকারী।[৭]

---

* মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর।

১. মুসলিম হা/২২৪; আবূদাঊদ হা/৫৯; তিরমিযী হা/১।
২. বুখারী হা/১৯৩৪; মুসলিম হা/২২৬; মিশকাত হা/২৮৭।
৩. মুসলিম হা/২৫১; মিশকাত হা/২৮২।
৪. বুখারী হা/১৬২; মুসলিম হা/২৭৮।
৫. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ১/৪৪ পৃঃ।
৬. ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৩৭।
৭. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৪৫-৪৬।

www.at-tahreek.com

নাক মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই নাকের মধ্যে এমন একটি যন্ত্র সৃষ্টি করে রেখেছেন, যার মাধ্যমে মানব দেহের চির শত্রু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবাণু যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশের চেষ্টা করে তখন সেগুলোকে আটকে দেয়। হামলা প্রতিহত করে ও ধ্বংস করে দেয়। এদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী মুছল্লী কম পক্ষে দৈনিক পাঁচ বার উক্ত নাক পরিস্কার করে। এর ফলে মুছল্লীদের স্থায়ী সর্দি, কাশি কিংবা নাকে মারাত্মক ব্যাধি পরিলক্ষিত হয় না।[৮]

(৩) মানুষের সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু হ'ল মুখ। বাতাসের সাথে ঘুরে বেড়ায় অসংখ্য ধূলিকণা, ধোঁয়া ও রোগজীবাণু। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাপড়ে ঢাকা থাকলেও মুখ সব সময়ই খোলা থাকে। ফলে ধূলোবালি, ধোঁয়া ও রোগজীবাণু মুখের চামড়ার সাথে লেগে যায়। বার বার মুখ ধৌত না করলে চেহারার লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং এলার্জি, চর্মরোগ, মেছতা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। ওযূর মাধ্যমে দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার মুখ ধৌত করার ফলে এসকল রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

(৪) মুখমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে চোখ ও ভ্রূ। ওযূ করার সময় চোখের ভ্রূগুলো ভিজে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, ভ্রূতে আর্দ্রতা থাকলে চক্ষু এমন এক মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পায়। যা চোখের ভিতরের আর্দ্রতা হ্রাস পেয়ে নিঃশেষ হয়ে পড়ে। ফলে রোগী ধীরে ধীরে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে।

চোখে ব্যথা বা কোন অসুখ হ'লে চিকিৎসকগণ বলেন, চোখে শীতল পানি ছিটিয়ে দিতে। বস্তুত পানি এমন এক মহা প্রতিষেধক যার দ্বারা চোখের সর্বপ্রকার রোগ নিঃশেষ হয়ে যায়। ধূলোবালি যেভাবে চেহারা ও নাককে প্রভাবিত করে, তেমনিভাবে চোখকেও প্রভাবিত করে থাকে। চোখ উঠা রোগ ধূলোবালির কারণেই হয়ে থাকে।

(৫) কনুই পর্যন্ত সাধারণত আবৃত থাকে। এতে যদি পানি ও বাতাস না লাগে, তাহ'লে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর নানাবিধ রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। কনুইতে হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও যকৃতের সাথে সম্পৃক্ত তিন প্রকার বৃহৎ শিরা (Veins) থাকে। কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করলে উপরিউক্ত তিনটি অঙ্গে শক্তি সঞ্চার হয় এবং তা রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে।

ফ্রান্সের জনৈক ডাক্তারের গবেষণা মতে, মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সিগন্যাল পুরো শরীরে বিস্তৃত হয়ে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্মক্ষম হয়। তাই মাথা মাসেহ করলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৬) বেশী ধূলাবালি ও জীবাণু আক্রান্ত হয় আমাদের পা সমূহ। মানব দেহের 'ইনফেকশন' সর্বপ্রথম শুরু হয় পায়ের আঙ্গুলের মধ্য হ'তে। তাই ইসলাম আমাদের জন্য দিনে পাঁচবার পা ধৌত করা ও আঙ্গুলসমূহ খেলালের নির্দেশ দিয়েছে। যেন আঙ্গুলের মধ্যে কোন প্রকার জীবাণু আটকে না থাকে। পা ধৌত করার দ্বারা বহু রোগ-ব্যাধিরও অবসান ঘটে। যেমন অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, দুশ্চিন্তা, মস্তিষ্ক-শুষ্কতা, অনিদ্রা ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি নিঃশেষ হয়ে যায়।[৯]

American council for beauty সংস্থার সম্মানিত সদস্যা লেডী হীচার বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন প্রকার রাসায়নিক লোশন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই, তারা ইসলামী পন্থায় ওযূ দ্বারা চেহারার যাবতীয় রোগ থেকে রক্ষা পায়। জনৈক ইউরোপীয় ডাক্তার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল 'চক্ষু-পানি-সুস্থতা'। উক্ত প্রবন্ধে তিনি এ কথার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন যে, নিজের চক্ষুকে দিনে কয়েক বার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, নতুবা মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'তে পারে।[১০]

ছালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম :

ছালাত শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতই নয়; বরং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়ামও বটে। ছালাতের মধ্যকার প্রতিটি কর্মকাণ্ড মানব শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এক একটি ব্যায়াম। যেমন- উভয় পা সমান্তরাল রেখে উভয় পায়ের উপর সমান ভর দিয়ে কিবলামুখী হয়ে দণ্ডায়মান হওয়া। অতঃপর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে[১১] বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকে হাত বেঁধে দণ্ডায়মান হওয়া।[১২] এ সময় দৃষ্টি সিজদার স্থান বরাবর রাখা[১৩], ছানা, সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা বা আয়াত পাঠ করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা।[১৪] অতঃপর তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দু'হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করে[১৫] দুই হাতের আঙ্গুল খোলা রেখে দু'হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে মাথা ও পিঠ সমান্তরাল রেখে রুকূ করা[১৬] এবং দৃষ্টিকে সিজদার স্থানে স্থির রাখা।[১৭] রুকূ থেকে মাথা উত্তোলনের সময় পূর্বের ন্যায় দু'হাত উত্তোলন করা।[১৮] অতঃপর নাক সহ কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পায়ের আঙ্গুল সমূহের অগ্রভাগসহ মোট সাতটি অঙ্গ মাটিতে লাগিয়ে[১৯] এমনভাবে সিজদা করা যাতে হাত দু'খানা কিবলামুখী করে এবং মাথার দু'পাশে কাঁধ বা কান বরাবর রেখে[২০] কনুই ও বগল ঢেকে রাখা।[২১] সিজদাতে বগল ও বুক এতটুকু উঁচু রাখা যাতে বুকের নীচ দিয়ে একটা বকরীর বাচ্চা অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে।[২২] সিজদা হ'তে উঠে এমনভাবে বসা যাতে বাম পায়ের পাতার উপর নিতম্ব থাকে

৮. ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৩৮।

৯. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/৪৩-৫২।
১০. ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৩৮।
১১. বুখারী হা/৮২৮; মিশকাত হা/৭৯২।
১২. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৭৯; আবূদাঊদ হা/৭৫৫, সনদ ছহীহ।
১৩. হাকেম, বায়হাক্বী, ছিফাতু ছালাতিন্নাবী, পৃঃ ৬৯।
১৪. বুখারী হা/৭৪৪; মুসলিম হা/৫৯৮; আবূদাঊদ হা/৮৫৯, ৮৬০; মিশকাত হা/৮০৪, ৮১২।
১৫. বুখারী হা/৭৩৫, ৭৩৯; মিশকাত হা/৭৯৪-৭৯৫।
১৬. বুখারী হা/৮২৮; মিশকাত হা/৭৯২।
১৭. হাকেম, বায়হাক্বী, ছিফাতু ছালাতিন্নাবী, পৃঃ ৬৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০৪।
১৮. বুখারী হা/৭৩৫, ৭৩৯; মিশকাত হা/৭৯৪-৭৯৫।
১৯. বুখারী হা/৮১২; মুসলিম হা/৪৯০; মিশকাত হা/৮৮৭।
২০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৩; আবূদাঊদ, তিরমিযী, নায়লুল আওত্বার ৩/১২১।
২১. মুসলিম হা/৪৯৫; বুখারী হা/৩৯০; মিশকাত হা/৮৯১।
২২. আবূদাঊদ হা/৮৯৮; মুসলিম হা/৪৬৯; মিশকাত হা/৮৯০।

এবং ডান পায়ের আঙ্গুল সমূহ মাটিতে রেখে পা খাড়া থাকে।[২৩] অতঃপর পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা করা এবং সিজদা থেকে উঠে সুস্থির হয়ে বসা।[২৪] অতঃপর মাটির উপর দু'হাতে ভর করে দণ্ডায়মান হওয়া।[২৫] অতঃপর ক্বিরাআত পাঠ শেষে পূর্বের ন্যায় রুকূ-সিজদা করা এবং সিজদা থেকে উঠে ১ম বৈঠক হ'লে বাম পা পেতে তার উপর বসা এবং শেষ বৈঠক হ'লে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা।[২৬] বৈঠকের সময় বাম পায়ের আঙ্গুল সমূহ বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর কিবলামুখী রাখা এবং ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রেখে সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত ইশারা করতে থাকা।[২৭] সবশেষে শরীর স্থির রেখে ডান দিকে ও বাম দিকে মাথা ঘুরিয়ে সালাম দেয়া।[২৮]

ছালাতের মধ্যকার উল্লিখিত পদ্ধতিগুলো এক একটি আদর্শ ব্যায়াম। ব্যায়ামের সময় যেসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা হয়, তার সব ক'টিই রয়েছে ছালাতের মধ্যে। এজন্য পাকিস্তানের প্রখ্যাত ডাক্তার ও ইসলামী গবেষক মুহাম্মাদ তারেক মাহমূদ বলেন, 'ছালাত হ'ল এক উত্তম শরীর চর্চা। অলসতা, বিষণ্ণতা ও বে-আমলীর এ যুগ-সন্ধিক্ষণে ছালাতই এমন এক ব্যায়াম, যা সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করা হ'লে তার দ্বারা ইহকালীন সকল ব্যথার উপশম সম্ভব। ছালাতের ব্যায়াম যেমনিভাবে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ, তেমনি আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন- হৃৎপিণ্ড, যকৃত, মূত্রাশয়, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, নাড়িভুড়ি, পাকস্থলী, মেরুদণ্ড, গর্দান, বক্ষ ও সর্বপ্রকার Glands-কে বর্ধিত করে শরীরকে সুঠাম ও সুন্দর করে তোলে। আর এ ব্যায়ামগুলির দ্বারা আয়ুও বৃদ্ধি পায়। পাওয়া যায় এক অসাধারণ শক্তি।[২৯]

পাকিস্তানের আরেক প্রথিতযশা ডাক্তার মাজেদ যামান ওছমানী বলেন, ছালাতের মাধ্যমে নিম্নোক্ত রোগগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। (১) মানসিক রোগ (২) স্নায়ুবিক রোগ (৩) অস্থিরতা, ডিপ্রেশন, ব্যাকুলতার রোগ (৪) মনস্তাত্ত্বিক রোগ (৫) হার্ট-এর রোগ (৬) হাড় জোড়া রোগ (৭) ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ (৮) পাকস্থলী ও আলসার রোগ (৯) ডায়াবেটিস ও তার প্রভাব (১০) চক্ষু ও গলা রোগ।[৩০]

সতর্কতা :

ছালাতের স্বাস্থ্যগত উপকারিতার জন্য যদি কেউ আজীবন ছালাত আদায় করে তাহ'লে সে উপকারিতা সে পাবে বটে। কিন্তু এ ছালাতের বিনিময়ে সে পরকালে কিছুই পাবে না। কেননা সমস্ত আমলের প্রতিদান নির্ভর করে তার নিয়তের উপর।[৩১] ছালাতসহ যেকোন আমলে ছালেহ করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রেযামন্দি হাছিল ও পরকালীন মুক্তির প্রত্যাশায়। নচেৎ এ ধরনের আমলের কারণেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে।[৩২]

জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা :

জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মসজিদে গিয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্নভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا، 'ঘরে অথবা বাজারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার ছওয়াব ২৫ গুণ বেশী'।[৩৩] অন্য বর্ণনায় ২৭ গুণের কথা এসেছে।[৩৪] অন্ধ ব্যক্তিকেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৫] মসজিদে জামা'আতে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের বাড়ী-ঘর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছা পোষণ করতেন।[৩৬] এমন আরো অনেক হাদীছ রয়েছে, যেগুলো দ্বারা জামা'আতের গুরুত্ব বুঝা যায়।

মসজিদে জামা'আতে শরীক হওয়াতে যেমন রয়েছে পরকালীন কল্যাণ, তেমনি রয়েছে ইহকালীন তথা স্বাস্থ্যগত কল্যাণ। শারীরিক সুস্থতার জন্য নিয়মিত হাঁটাহাটি অনেক উপকারী। আর মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে হ'লে মুছল্লীকে নিয়মিত হাঁটাহাটি করতে হয়। মুছল্লীদের বাড়ী মসজিদ থেকে গড়ে ৫০০ গজ দূরে থাকলে ঐ মুছল্লীকে ৫ ওয়াক্ত জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য দৈনিক কমপক্ষে দুই মাইল হাঁটতে হয়। যা একজন মানুষের সুস্থ থাকার জন্য যথেষ্ট। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ নিয়মিত হাঁটাহাঁটির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে সমস্ত আমলে ছালেহ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে। এ সকল আমলে দুনিয়াবী কোন কল্যাণ থাকলে সেটা হবে বোনাস তথা অতিরিক্ত প্রাপ্য।

ডাঃ এ হাসনাত শাহীন বলেন, 'স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিয়মিত হাঁটাহাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটাতে শরীরের ওযন, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে, কমবে হৃদরোগ ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের (স্ট্রোক) ঝুঁকি। হাঁটু ব্যথা হয় সাধারণত অস্টিও আথ্রাইটিসের কারণে। মধ্য বয়সের পরে হাঁটু, কোমর বা পায়ের জোড়া বা সন্ধি ক্ষয়ে যেতে পারে। অস্তিসন্ধিতে দুই হাড়ের মাঝে যে

২৩. *বুখারী হা/৮২৮; মিশকাত হা/৭৯২।*
২৪. *বুখারী হা/৮২৩; মিশকাত হা/৭৯৬।*
২৫. *বুখারী হা/৮২৪।*
২৬. *বুখারী হা/৮২৮; মিশকাত হা/৭৯২।*
২৭. *মুসলিম হা/৫৮০; মিশকাত হা/৯০৬; মির'আত ৩/২২৯।*
২৮. *আবূদাঊদ হা/৬৬৯; নাসাঈ হা/১৩২৪; মিশকাত হা/৯৫০।*
২৯. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ১/৫৬ পৃঃ।*
৩০. *প্রাগুক্ত ১/৫৯ পৃঃ।*
৩১. *বুখারী হা/১, ৫৪, ২৫২৯; মুসলিম হা/১৯০৭; আবূদাঊদ হা/২২০১।*
৩২. *মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৪।*
৩৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৭০২।*
৩৪. *বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৫০; মিশকাত হা/১০৫২।*
৩৫. *মুসলিম হা/৬৫৩; মিশকাত হা/১০৫৪।*
৩৬. *বুখারী হা/৬৪৪, ২৪২০; মিশকাত হা/১০৫৩।*

পিচ্ছিল তরল পদার্থ থাকে, তা নড়াচড়ার সময় হাড়ের পরস্পর ঘর্ষণে বাধা দেয়। কিন্তু এই তরল পদার্থ শুকিয়ে গেলে হাড়ের ঘর্ষণে তরুণাস্থি ক্ষয়ে যায়। তখনই শুরু হয় হাঁটুর ব্যথা। হাঁটু ব্যথা কমাতে হ'লে শরীরের ওযন কমানো যরূরী। আর ওযন কমানোর কার্যকর একটি উপায় হ'ল হাঁটা। একাধিক গবেষণায় দেখা যায়, প্রায় আধা কেজি ওযন কমালে হাঁটুর ওপর চাপ প্রায় চারগুণ কমে। তাছাড়া নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করলে পায়ের মাংসপেশী সুগঠিত হয়ে হাঁটুর উপর চাপ কমে এবং অস্থিসন্ধির কার্যকারিতা বাড়ে'।[৩৭]

প্রখ্যাত স্নায়ু বিজ্ঞানী শেন ওমারা হাঁটার কিছু উপকারিতা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, হাঁটার আছে অনেক উপকারিতা। এর ফলে পেশী সুগঠিত হয়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুরক্ষিত থাকে ও মেরামত হয়, হজমে সাহায্য করে এবং মস্তিষ্ককে সতেজ রেখে বার্ধক্য প্রতিরোধ করে। হাঁটাহাঁটির ফলে মানুষের চিন্তার সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়, মেযাজ ভাল থাকে এবং স্ট্রেস বা মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। আমরা যখন হাঁটি তখন পেশীতে তৈরী হওয়া মালকিউল বা অণু আমাদের মস্তিষ্ককে সচল রাখে এবং শক্তিশালী করে। হৃদপিণ্ড ভাল থাকার জন্য হাঁটা খুবই উপকারী। হাঁটা মানুষের পরিপাকতন্ত্রের জন্য বন্ধুর মত কাজ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য কাটাতে ঔষধ না খেয়ে হাঁটলে খুব সহজে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। বিষণ্ণতা এক ধরনের রোগ। এক্ষেত্রে হাঁটাহাঁটি করা এক ধরনের ভ্যাকসিন বা টিকার মতো কাজ করে। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাদেরকে সারাদিন চেয়ারে, সোফায় কিংবা গাড়িতে বসে কাজ করতে হয়। এর ফলে শারীরিক গঠনে বিশেষ করে পিঠে ব্যথা হ'তে পারে। এক্ষেত্রে নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করা পিঠের ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে।[৩৮]

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নিয়মিত মসজিদে গিয়ে আদায় করলে পৃথকভাবে আর হাঁটাহাঁটি অথবা অন্য কোন ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে মসজিদ থেকে দূরবর্তী মুছল্লী অধিক লাভবান হন। নেকী ও স্বাস্থ্যগত উভয় দিক থেকেই তিনি লাভবান হন।

ওযূ সহ ডান কাতে শয়ন করা :

ওযূ করে ডান কাতে শয়ন করা সুন্নাত।[৩৯] পাকিস্তানের বিখ্যাত ডাক্তার ও গবেষক তারেক মাহমূদ বলেন, হাফিয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) 'আত-তিব্বুন নববী' গ্রন্থে লিখেছেন, ঘুমানোর সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে ডান কাতে ঘুমানো। এতে করে খাবার পেটে ভালোভাবে স্থির হয়ে যায়। কেননা পাকস্থলী এমনিতে বাম দিক ঝুঁকে থাকে। অতঃপর দ্রুত খাবার হজমের সুবিধার্থে সামান্য সময়ের জন্য বাম কাতে চলে আসবে। কারণ পাকস্থলী কলিজার দিকে ঝুঁকে থাকে। এরপর ডান কাতে স্থির হয়ে যাবে। যেন খাবার দ্রুত পাকস্থলী থেকে নেমে যায় এবং নাড়িভূঁড়িতে পৌঁছে যায়। এভাবে ঘুমের শুরু হবে ডান কাতে এবং শেষ হবে ডান কাতে। আর বাম কাতে বেশী সময় ঘুমানোর কারণে কলবের ক্ষতি হয়। কারণ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকর্ষণ ধাবিত থাকে কলবের দিকে। তাই উচ্ছিষ্ট পদার্থ বাম দিকে ঝুঁকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।[৪০]

আজকের বিজ্ঞান বলে, বাম কাত হয়ে শয়ন করলে গভীর ঘুম আসে। তবে ডান কাতে শয়ন করলে গভীর নিদ্রাও আসে আবার তার ঘুম শীঘ্র পূর্ণও হয়ে যায়। ফলে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জাগতে পারে।

অপর এক গবেষণা অনুযায়ী বাম দিকে কাত হয়ে শয়ন করলে ভয়াবহ স্বপ্ন বেশী হয়। কারণ মানুষের হার্ট থাকে বাম দিকে। আর বাম দিকে শয়নকারী ব্যক্তির পাকস্থলী ও নাড়ীভুঁড়ির চাপ হার্টের উপর পড়ে এবং হার্টের উপর বৃদ্ধি পায় ফিজিক্যাল প্রেসার। আর হার্টের উপর প্রেসার বৃদ্ধি পেলে ভয়াবহ স্বপ্ন দেখতে পায়। যেন কেউ হৃদপিণ্ডকে ধরে রেখেছে।[৪১]

উপুড় হয়ে শয়ন আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللهُ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, এভাবে শয়ন করা আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন না'।[৪২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِى فَرَكَضَنِى بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَا جُنَيْدِبُ إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ، 'আমি উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি স্বীয় পা দ্বারা আমাকে ঠোকা দিয়ে বললেন, হে জুনদুব! শোয়ার এ পদ্ধতি জাহান্নামীদের শয়ন পদ্ধতি'।[৪৩]

হাফিয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) 'আত-তিব্বুন নববী' গ্রন্থে লিখেছেন, 'প্রাচীন গবেষক বুকরাত স্বীয় গ্রন্থ আত-তাকদিমাহ-তে লিখেছেন, অসুস্থ ব্যক্তির অভ্যাস ছাড়া উপুড় হয়ে শোয়া তার মস্তিষ্কের বিকৃতি অথবা পেট ব্যথার প্রমাণ। আত-তাকদিমাহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার লিখেছেন, কারণ সে নিজের ভাল অভ্যাস ছেড়ে খারাপ আকৃতিকে গ্রহণ করেছে। অথচ তার ভেতরে অথবা বাইরে কোন অপারগতা নেই।[৪৪]

---

৩৭. *দৈনিক প্রথম আলো, হাঁটু ব্যথায় হাঁটাহাঁটি (প্রবন্ধ), ১লা মার্চ ২০১৭।*
৩৮. *bbc.com, ২০শে জানুয়ারী ২০২০।*
৩৯. *বুখারী হা/২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩; মুসলিম হা/২৭১০।*
৪০. *আত-তিব্বুন নববী, পৃঃ ৩৮১-৩৮২।*
৪১. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/১২৯ পৃঃ।*
৪২. *তিরমিযী হা/২৭৬৮; ছহীহুল জামে' হা/২২৭০; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৭৯।*
৪৩. *ইবনু মাজাহ হা/৩৭২৪; আহমাদ হা/২৩৬১৪, সনদ ছহীহ।*
৪৪. *আত-তিব্বুন নববী, পৃঃ ৩৮২।*

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, 'উপুড় হয়ে শয়ন করলে নাকে-মুখে রক্ত এসে মৃত্যু হ'তে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপুড় হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন'।[৪৫]

দেহের অর্ধেক ছায়ায় ও অর্ধেক রোদে রেখে বসা নিষেধ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الْفَىْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَعْضُهُ فِى الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِى الظِّلِّ فَلْيَقُمْ، 'তোমাদের কেউ যখন ছায়ায় বসে অতঃপর তার উপর হ'তে ছায়া চলে যায় এবং এ অবস্থায় তার শরীরের কিছু অংশ রোদে এবং কিছু অংশ ছায়ায় থাকে, তবে সে যেন সেখান থেকে উঠে চলে যায়'।[৪৬]

অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ডাক্তারগণ গবেষণা করে বের করেছেন, শরীরে কিছু অংশ রোদে আর কিছু অংশ ছায়ায় থাকলে, মানুষের দেহে ও মেযাজে যথেষ্ট ক্ষতি হ'তে পারে। এতে কুষ্ঠরোগ ও চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া মানসিক দিক দিয়ে মেযাজ খিটখিটে ও চঞ্চল হয়ে পড়ে। ফলে কোন ভালো কাজে লিপ্ত থাকে না। তাই এরূপ স্থানে বসতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪৭]

সাদা সুতি পোষাক পরিধান করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ، 'তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো। কেননা তা অতি পবিত্র ও অধিক পসন্দনীয়। আর তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ে কাফন পরাও'।[৪৮]

সাদা কাপড় সর্বপ্রকার আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে থাকে। তীব্র গরম মওসুমে সাদা পোষাক গরম হয় না। কেননা তা গরমকে আকর্ষণ করে না। অপরদিকে তীব্র শীতের মওসুমে ঠাণ্ডার কারণে তা শীতলও হয়ে যায় না।

ক্রোমোপ্যাথির অভিমত : রঙ ও আলো বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, সাদা পোষাক হ'ল ক্যান্সার থেকে প্রতিরক্ষার সর্বোত্তম ঔষধ। এমনকি বিশেষজ্ঞগণের মতে সাদা পোষাক পরিধানকারী ব্যক্তি ঘামের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার ও ছোতো রোগ (Fungal Infection)-এর মতো মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা পেতে পারে। তারা চর্ম এলার্জি (Skin Allergy) এবং উচ্চ রক্তচাপে (High Blood Pressure) আক্রান্ত রোগীদেরকে সর্বদা সাদা পোষাক পরিধানের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ক্রোমোপেথী নীতি অনুযায়ী সাদা পোষাক মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড ও চর্মের সংরক্ষক।[৪৯]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ- 'নবী করীম (ছাঃ) হিবারাহ কাপড় পরিধান করতে অধিক পসন্দ করতেন'।[৫০]

'হিবারাহ' বলা হয় সাদা কাপড়ের মধ্যে সবুজ অথবা লাল ডোরাযুক্ত ইয়ামান দেশে বুনানো অতীব উন্নত সুতী কাপড়কে।[৫১]

ডাঃ তারেক মাহমূদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পোষাক ছিল সুতী কাপড়ের। সুন্নাত অনুযায়ী সুতী পোষাকের কি কি উপকারিতা রয়েছে এবং অন্যান্য পোষাকে কি কি অপকারিতা রয়েছে, তা আমাদের জানা দরকার। (১) আল্লাহ না করুন! কারও শরীরে আগুন লেগে যায়, তাহ'লে শরীরে সুতী পোষাক থাকলে তাতে ক্ষতি কম হয়।

(২) সুতী পোষাক গরম সহিষ্ণু হয়। উষ্ণ দেশসমূহে এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সুব্যবস্থাই নেই।

(৩) যে শরীরে সুতী পোষাক থাকবে, সে শরীর চর্মরোগে আক্রান্ত হবে না। কেননা পলিয়েস্টার বা নায়লন সুতার পোষাক শরীরের ঘর্ষণে তীব্র গরম হয়ে যায়। আর এর তাপ শরীরের তাপের সাথে মিশে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে চর্মরোগ সৃষ্টি হয়।

সুতী পোষাক দেহের তাপমাত্রায় ভারসাম্য রাখে। ফলে চর্মরোগ ও মানসিক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অথচ পলিয়েস্টার কাপড়ের পোষাক দু'টি মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করে। একটি হ'ল মহিলাদের লিকুরিয়া আর অপরটি হ'ল পুরুষদের যৌনরোগ।[৫২]

ডাঃ লূথর এম এর গবেষণা :

ডা. লূথর ছিলেন জার্মানের প্রসিদ্ধ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, যখন থেকে মানুষ সুতী পোষাক পরিত্যাগ করেছে, তখন থেকে তারা নিম্নোক্ত রোগসমূহে আক্রান্ত হ'তে বাধ্য হয়েছে।

ক. চর্ম ক্যান্সার (Skin Cancer)

খ. চামড়ার গোশতগ্রন্থির ক্যান্সার (Skin Glands Cancer)

গ. মহিলাদের বক্ষ ক্যান্সার (Breast Cancer)

ঘ. টিসু ক্যান্সার (Tussues Cancer)

ঙ. হরমোন ক্যান্সার (Harmonies Cancer)

চ. চর্ম চুলকানী (Allergic Cancer)

ছ. একজিমা (Eczema)।[৫৩]

[ক্রমশঃ]

৪৫. মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ৪৭১৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৪৬. আবুদাঊদ হা/৪৮২১; ছহীহাহ হা/৮৩৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৮৪।
৪৭. মিরকাতুল মাফাতীহ, ৪৭২৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৪৮. আহমাদ হা/২০২০; তিরমিযী হা/৯৯৪, ২৮১০; নাসাঈ হা/১৮৯৬, সনদ ছহীহ।
৪৯. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/৯৩০।
৫০. বুখারী হা/৫৮১৩; মুসলিম হা/২০৭৯; তিরমিযী হা/১৭৮৮।
৫১. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/১৯০ পৃঃ।
৫২. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ১/১৩১ পৃঃ।
৫৩. প্রাগুক্ত, ১/১৩২ পৃঃ।

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০২১ ২৪তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

অল্পে তুষ্টি

-*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(২য় কিস্তি)

অল্পে তুষ্টির নমুনা

রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে অল্পে তুষ্টি :

মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি ছিলেন মানবজীবনের সকল কল্যাণকর বিষয়ে সর্বোত্তম আদর্শ ব্যক্তিত্ব। কেননা তিনি জগৎবাসীর জন্য রহমত ও উসওয়াহে হাসানাহ বা 'সর্বোত্তম নমুনা' হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন *(আম্বিয়া ২১/১০৭; আহযাব ৩৩/২১)*। তিনি ছিলেন ঈমান ও ইয়াক্বীনের বলে বলীয়ান অল্পে তুষ্ট থাকা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এবং মানবজাতির জন্য অল্পে তুষ্ট জীবনের পথিকৃত। যারা ইন্দ্রিয়ের সর্বানুভূতির চিহ্ন ক্ষয় করে তাঁর আদর্শকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সেই আলোকে জীবন গড়তে সক্ষম হয়েছেন, তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তির ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অল্পে তুষ্ট জীবন বেছে নিয়েছিলেন এবং তাঁর মহান আদর্শের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতকে সেই জীবনের দিকে আহ্বান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের বাঁকে-বাঁকে অল্পে তুষ্টির নমুনা পাওয়া যায়। এখানে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

ক. পরিবারকে অল্পে তুষ্টির শিক্ষা প্রদান :

রাসূল (ছাঃ) তাঁর পরিবার-পরিজনকে অল্পে তুষ্টি, ধৈর্যশীলতা এবং দুনিয়াবিমুখতার দিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আখেরাতমুখী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। খায়বার যুদ্ধের পরে যখন মুসলমানদের অবস্থা পূর্বের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল হ'ল, তখন মুহাজির ও আনছারদের স্ত্রীদের দেখাদেখি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণও খোরপোষের পরিমাণ বৃদ্ধি করার দাবী জানালেন। নবী করীম (ছাঃ) যেহেতু বিলাসহীন অনাড়ম্বর ও অল্পে তুষ্ট জীবন-যাত্রা পসন্দ করতেন, সেহেতু স্ত্রীদের এই দাবীতে মনঃক্ষুণ্ণ হ'লেন এবং এক মাসের জন্য স্ত্রীদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে একাকী বাস করা শুরু করলেন। অবশেষে আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, 'হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাস-ব্যসন কামনা কর, তবে এস আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের গৃহ কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যেকার সৎকর্মশীলদের জন্য মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন' *(আহযাব ৩৩/২৮-২৯)*।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে এটা শুনিয়ে তাকে সংসারে থাকা ও না থাকার ব্যাপারে এখতিয়ার দিলেন এবং বলে দিলেন, নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে পিতা-মাতার পরামর্শ নিয়ে যা করার করবে।

** এম. এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

আয়েশা (রাঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন, এই ব্যাপারে আব্বা-আম্মার সাথে পরামর্শ করার কি আছে? বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পসন্দ করি। অন্য সকল স্ত্রীগণও এই একই মত ব্যক্ত করলেন এবং কেউ রাসূল (ছাঃ)-কে ত্যাগ করে পার্থিব প্রাচুর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাধান্য দিলেন না'।[১]

খ. খাদ্যের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর অল্পে তুষ্টি :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খানাপিনার ব্যাপারে অল্পে তুষ্ট ছিলেন। উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, একবার আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) আমাকে বললেন, 'হে ভাগ্নে! আমরা দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু (এর মধ্যে) আল্লাহ্‌র রাসূলের বাড়ির চুলাগুলোতে আগুন জ্বলত না। আমি বললাম, আপনারা কিভাবে দিনাতিপাত করতেন? তিনি বললেন, الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، 'দু'টি কালো বস্তু- খেজুর ও পানি দিয়ে'।[২] অন্যত্র আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا، حَتَّى قُبِضَ، 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) মদীনায় আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা এক নাগাড়ে তিন রাত গমের রুটি পেট পুরে খাননি'।[৩] আবূ ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমরা একবার আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর দাওয়াতে হাযির হ'লাম। খাওয়ার শুরুতে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ، 'আপনারা খান! আমার জানা নেই- নবী কারীম (ছাঃ) মৃত্যুর সময় পর্যন্ত পাতলা রুটি দেখেছেন কি-না। আর তিনি কখনো ভুনা বকরির গোশত চোখে দেখেননি'।[৪]

গ. রাসূল (ছাঃ)-এর বিছানা :

রাসূল (ছাঃ) আখেরাতমুখী সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। দুনিয়ার যৎসামন্য আসবাবপত্রে তাঁর অল্পে তুষ্টির নমুনা তুলনাহীন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী কারীম (ছাঃ) একটি খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তাঁর দেহের চামড়ায় (মাদুরের) দাগ বসে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য মাদুরের উপর কিছু (তোষক) বিছিয়ে দিতাম। তাহ'লে তা আপনাকে দাগ লাগা থেকে বাঁচিয়ে রাখত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّمَا أَنَا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا، 'দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কি? আমি দুনিয়াতে এমন এক মুসাফির বৈ

১. বুখারী হা/৪৭৮৬; মুসলিম হা/১৪৭৫।
২. বুখারী হা/৬৪৫৯; মুসলিম হা/২৯৭৩।
৩. বুখারী হা/৫৪১৬; মুসলিম হা/২৯৭০; মিশকাত হা/৫২৩৭।
৪. বুখারী হা/৫৪২১; ইবনু মাজাহ হা/৩৩০৯; মিশকাত হা/৪১৭০।

www.at-tahreek.com

তো কিছু নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল। অতঃপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের দিকে চলে গেল'।[৫]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ، وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরী এবং তার ভিতরে ছিল খেজুর পাতার আঁশ'।[৬]

ঘ. পার্থিব শান-শওকত ও সম্পদের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর অল্পে তুষ্টি :

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। সে সময় তিনি খেজুর পাতা নির্মিত একটি চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। আমি সেখানে বসে পড়লাম। তিনি তার চাঁদরখানি স্বীয় শরীরের উপরে টেনে দিলেন। তখন এটি ছাড়া তার পরনে অন্য কোন কাপড় ছিল না। আর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আসবাবপত্রের দিকে তাকালাম। আমি সেখানে একটি পাত্রে এক ছা' (আড়াই কেজি) এর কাছাকাছি কয়েক মুঠো যব দেখতে পেলাম। অনুরূপ বাবলা জাতীয় গাছের কিছু পাতা (যা দিয়ে চামড়ায় রং করা হয়) কামরার এক কোণায় পড়ে থাকতে দেখলাম। আরও দেখতে পেলাম ঝুলন্ত একখানি চামড়া, যা পাকানো ছিল না। ওমর (রাঃ) বলেন, এসব দেখে আমার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি (ছাঃ) বললেন, مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! 'হে খাত্ত্বাবের পুত্র! কিসের কারণে তোমার কান্না পেয়েছে?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র নবী! কেন অমি কাঁদব না? এই যে চাটাই, যা আপনার শরীরের পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে আপনার কোষাগার। এখানে সামান্য কিছু যা দেখলাম তাছাড়া তো আপনার আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে ঐ যে রোমক বাদশাহ ও পারস্য সম্রাট, কত বিলাস ব্যসনে ফলমূল ও ঝরণা পরিবেষ্টিত হয়ে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করছে। অথচ আপনি হ'লেন আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তি। আর আপনার কোষাগার হচ্ছে এই!' তখন তিনি বললেন, يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟ 'হে খাত্ত্বাবের বেটা! তুমি কি এতে পরিতুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত আর তাদের জন্য দুনিয়া (পার্থিব ভোগ বিলাস)। আমি বললাম, নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট'।[৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ، 'আমার কাছে যদি ওহোদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকত, তাহ'লে আমার পসন্দ নয় যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমার কাছে তার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকুক। তবে সেই পরিমাণ ব্যতীত, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দেই'।[৮] রাসূল (ছাঃ)-এর এই অল্পে তুষ্টির দৃষ্টান্ত যুগ যুগান্তরে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণক্ষরে চির ভাস্বর হয়ে আছে। রাসূল (ছাঃ)-এর সেই সোলানী আদর্শ আখেরাতের জন্য পাগলপরা প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। সেই আদর্শের সোপান পেরিয়ে বান্দা অল্পে তুষ্টির মহান জীবনে পদার্পন করতে পারে।

ছাহাবায়ে কেরামের অল্পে তুষ্ট জীবন :

ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সনিষ্ঠ অনুসারী। রাসূল (ছাঃ)-এর অল্পে তুষ্ট জীবনকে তারা খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তাঁর জীবনাদর্শের দ্যুতি দিয়ে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করেছিলেন। ছাহাবায়ে কেরামের জীবনাচরণে চোখ বুলালে নববী আদর্শের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে সংক্ষেপে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হ'ল-

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদেরকে অল্পে তুষ্টি শিক্ষা দিয়েছেন। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ 'যে ব্যক্তি আমার সাথে এই ওয়াদা করবে যে, সে কারো কাছে ভিক্ষার হাত বাড়াবে না, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিনদার হবো'। ছাওবান (রাঃ) বললেন, আমি। ফলে তিনি কারো কাছে কিছু চাইতেন না।[৯] এমনকি আরোহী থাকা অবস্থায় ছাওবান (রাঃ)-এর হাত থেকে যদি চাবুক নিচে পড়ে যেতো, তিনি কাউকে বলতেন না- এটা আমাকে তুলে দাও। বরং তিনি নিজে বাহন থেকে নেমে সেটা তুলে নিতেন।[১০]

(২) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীদের জীবনও ছিল সাদামাটা। বিশিষ্ট তাবেঈ হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, كُنْتُ أَدْخُلُ بُيُوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَأَتَنَاوَلُ سُقُفَهَا بِيَدِي، 'আমি ওছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে রাসূল (ছাঃ) স্ত্রীগণের ঘরসমূহে যাতায়াত করতাম। আমি তাদের ঘরের ছাদগুলো আমার দুই হাতের নাগালে পেতাম'।[১১] অর্থাৎ উম্মাহাতুল মুমিনীনে বসবাসের ঘরে ছাদ এত নিচু ছিল যে, দুই হাতে সেই ঘরের ছাউনি নাগাল পাওয়া যেত।

(৩) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আহলুছ ছুফ্ফার সত্তর জন ছাহবীকে এমন দেখেছি যে, তাদের কারো কাছে গা ঢাকার জন্য চাদর ছিল না। কারো লুঙ্গী ছিল এবং কারো চাদর ছিল। কিন্তু এক সঙ্গে দু'টি বস্ত্র কারো কাছে ছিল না। তারা সেই কাপড়টি গলায় বেঁধে নিতেন। অতঃপর কাপড়টি কারো অর্ধগোছা পর্যন্ত এবং কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছত। আর

৫. তিরমিযী হা/২৩৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৯; মিশকাত হা/৫১৮৮, সনদ ছহীহ।
৬. বুখারী হা/৬৪৫৬; মুসলিম হা/২০২৮।
৭. বুখারী হা/৪৯১৩; মুসলিম হা/১৪৭৯, শব্দাবলী মুসলিমের।
৮. বুখারী হা/২৩৮৯; মুসলিম হা/৯৯১।
৯. আবূদাঊদ হা/১৬৪৩; নাসাঈ হা/২৫৯০; মিশকাত হা/১৮৫৭, সনদ ছহীহ।
১০. ইবনু মাজাহ হা/; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩২৪৪, সনদ ছহীহ।
১১. বায়হাক্বী, শুআব হা/১০২৪৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৫০, সনদ ছহীহ।

www.at-tahreek.com

তারা হাত দিয়ে জামা ধরে রাখতেন, যাতে লজ্জাস্থান দেখা না যায়'।[১২]

(৪) উরওয়া ইবনু যুবাইর (রহঃ) বলেন, একবার আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে এক লক্ষ দিরহাম হাদিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তার খাদেমার মাধ্যমে সেই দিরহামগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করা শুরু করলেন। আল্লাহ্‌র কসম! সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই সব দিরহাম ছাদাক্বাহ করে শেষ করে দিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি খাদেমাকে খাবার প্রস্তুত করতে বলেন। কিন্তু তার ঘরে পর্যাপ্ত খাবার ছিল না। তাই খাদেমা আয়েশা (রাঃ)-কে বলল, 'আপনি যদি এক দিরহাম দিয়ে কিছু গোশত কিনে রাখতেন, তাহ'লে খাবারের আয়োজন করা যেত'। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি আমাকে আগে স্মরণ করিয়ে দাওনি কেন, তাহ'লে তো আমি কিছু গোশত কেনার ব্যবস্থা করতাম।[১৩] অর্থাৎ এতগুলো দিরহাম থেকে নিজের জন্য যে কিছু রাখতে হবে, সেটা তিনি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। সুতরাং সম্পদ সঞ্চয়কারী ও অপচয়কারী মুসলিম নর-নারীদের জন্য এই ঘটনাতে উপদেশ রয়েছে।

(৫) ছহীহ সনদে সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত আছে। আমের ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, যখন সালমান ফারেসী (রহঃ)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তাকে খুব পেরেশান ও অস্থির মনে হচ্ছিল। লোকেরা বলল, হে আবু আব্দিল্লাহ! আপনি এমন পেরেশান হচ্ছেন কেন? আপনার অতীত তো কল্যাণের সাথে অতিবাহিত হয়েছে। আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে অসংখ্য জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের বড় বড় বিজয়ে বীরোচিত অবদান রেখেছেন। তখন সালমান (রাঃ) বলেন, 'প্রিয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি বাণী আমাকে অস্থির করে তুলেছে। তিনি বলেছেন, لِيَكْفِ الْمَرْءَ مِنْكُمْ كَزَادِ الرَّاكِبِ 'তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির জন্য ততটুকু সম্পদই যথেষ্ট, যে পরিমাণ সম্পদ একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসাবে যথেষ্ট হয়'। রাবী বলেন, মৃত্যুর সময় সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর সম্পদের পরিমাণ ছিল মাত্র পনের দিরহাম। কোন কোন বর্ণনায় পনের দিনারের কথা উল্লেখ আছে।[14] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, সালমান ফারসী (রাঃ) দুই ফালি কাপড় পরিধান করে খুৎবাহ দিতেন। এক ফালি লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করতেন, আর এক ফালি গায়ে জড়িয়ে নিতেন। যখন তাকে কেউ কোন কিছু হাদিয়া দিত, তিনি সেটা দান করে দিতেন। আর তিনি নিজ হাতে খেজুর পাতার পাটি বুনাতেন এবং সেটা বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করতেন'।[১৫]

১২. *বুখারী হা/৪৪২; মিশকাত হা/৫২৪১।*
১৩. *ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, তাহক্বীক: আব্দুল ক্বাদের 'আত্বা (বৈরূত; দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০হি./১৯৯০খ্রি.) ৮/৫৩; মাক্বরীযী, ইমতা'উল আসমা' ৬/৪০।*
১৪. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০৬; তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৬১৮২; ছহীহাহ হা/১৭১৬।*
১৫. *আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/১৯৭; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ২১/৪৩৪; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/৫৪৭।*

সালাফে ছালেহীনের অল্পে তুষ্ট জীবন :

সালাফে ছালেহীন বলতে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, তাবে তাবেঈন ও তৎপরবর্তী হেদায়াতপ্রাপ্ত সম্মানিত ইমামগণকে বুঝানো হয়। এছাড়া যারা তাদের সনিষ্ঠ অনুসারী এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হেদায়াতের পথে পরিচালিত হয়েছেন, তাদেরকেও সালাফে ছালেহীনের মাঝে গণ্য করা হয়। সালাফদের ত্যাগপূত জীবন আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তাদের জীবনের পরতে পরতেও আমরা অল্পেতুষ্ট থাকার প্রেরণা খুঁজে পাই। তাদের আদর্শ আমদের হৃদয়তন্ত্রীতে অপার্থিব শক্তি সঞ্চারিত করে। নিম্নে কয়েকজন সৎকর্মশীল সালাফের জীবনী থেকে অল্পেতুষ্টির কিছু নমুনা দেওয়া হ'ল-

(১) প্রখ্যাত তাবেঈ আবু হাযেম আল-আশজা'ঈ (রহঃ) ছিলেন আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর ছাত্র। তার জীবন ছিল অল্পে তুষ্টির অনন্য উদাহরণ। একবার এক উমাইয়া খলীফা আবূ হাযেম (রহঃ)-এর নিকট একটি চিঠি লিখে পাঠালেন এবং তার কোন কিছু প্রয়োজন আছে কি-না জানতে চাইলেন। আবূ হাযেম (রহঃ) পত্রের জবাব দিয়ে বললেন, 'আপনার চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে। আপনি আমাকে অনুরোধ করেছেন- যেন আপনার কাছে আমার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করি। কিন্তু আমি তো আমার সব প্রয়োজন আল্লাহ্‌র কাছে ব্যক্ত করেছি। তিনি আমাকে যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করেছি এবং আমার থেকে যা কিছু নিবৃত্ত রেখেছেন, সেই ব্যাপারে পরিতুষ্ট থেকেছি। সুতরাং আমাকে আপনার সাহায্য করার কোন প্রয়োজন নেই'।[১৬]

(২) মুক্বাতিল ইবনে ছালেহ খুরাসানী (রহঃ) বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (রহঃ)-এর একটি অভূতপূর্ব কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মুক্বাতিল (রহঃ) বলেন, একদিন আমি হাম্মাদ (রহঃ)-এর সাথে তার ঘরে বসে ছিলাম। হঠাৎ তার দরজায় কে যেন করাঘাত করল। তিনি তার ছোট মেয়েকে বললেন, 'দেখ তো দরজায় কে এসেছে? মেয়েটি দেখে বলল, 'মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমানের বার্তাবাহক'। মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ছিলেন তৎকালীন বছরার গভর্নর। তিনি মেয়েকে বললেন, 'তাকে একা ঘরে ঢুকতে বল'। বার্তাবাহক একাই ঘরে ঢুকল এবং সালাম দিয়ে তার হাতে একটা চিঠি দিতে চাইল। হাম্মাদ (রহঃ) তাকে বললেন, 'তুমিই পড়ো!'। এরপর সে চিঠিটা পড়তে লাগল। চিঠির মূল বক্তব্যে বলা হয়েছিল, 'আমরা একটি মাসআলার সম্মুখীন হয়েছি। এই বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাই। আপনি দয়া করে আমাদের কাছে আসবেন'। চিঠি পড়া শেষ হ'লে হাম্মাদ (রহঃ) মেয়েকে কালি আনতে বললেন এবং বাহককে বললেন, 'পত্রের অপর পাতায় লেখো- إن وقعت مسألة فائتنا فتسألنا عما بدا لك وأن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك ولا تأتني بخيلك ورجلك فلا أنصحك ولا أنصح نفسي والسلام، 'কোন

১৬. *ইবনুস সুন্নী, আল-কানা'আত, মুহাক্কিক: আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আল-জুদা'ঈ (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশ্দ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯হি.) হা/১০, পৃ. ৪৩।*

www.at-tahreek.com

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০২১ ২৪তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

মাসআলা জানার থাকলে আমাদের কাছে আসবেন। যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করবেন। তবে একাকী আসবেন। কোন আশ্বারোহী ও দলবল নিয়ে আসবেন না। এরকম করলে আপনার প্রতি এবং আমার নিজের প্রতিও কোন প্রকার শুভ কামনা থাকবে না, ওয়াস্‌সালাম'। বাহক চিঠির উত্তর নিয়ে চলে গেল।

মুক্বাতিল (রহঃ) বলেন, আমি আগের মতোই বসে আছি। হঠাৎ কেউ একজন দরজায় করাঘাত করল। তিনি তার মেয়েকে বললেন, দেখো! দরজায় কে এসেছে। মেয়েটি দেখে বলল, 'মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান'। বললেন, 'তাকে ভিতরে আসতে বল'। গভর্নর মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার সামনে বসে কথা বলা শুরু করলেন। গভর্নর বললেন, مالي! إذا نظرت إليك امتلأت رعبا، 'আপনার দিকে তাকালে আমি ভীতু হয়ে পড়ি। এটা কেন হয়?'। হাম্মাদ (রহঃ) বললেন, العالم إذا أراد بعلمه وجه الله تعالى هابه كل شيء وإذا أراد يكثر به الكنوز هاب من كل شيء، 'আলেম যখন তার জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, তখন সবাই তাকে ভয় করে। আর সে যখন জ্ঞান দ্বারা ধন-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করে, তখন নিজেই অপরের ভয়ে তটস্থ থাকে'।

এরপর গভর্নর তার কাছে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল জেনে নিলেন। তারপর হাম্মাদ (রহঃ)-কে বললেন, আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে?' তিনি বললেন, هات ما لم يكن رزية في دين الله، 'দিতে পারেন, যদি আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে কোন ক্ষতি না হয়'। গভর্নর বললেন, 'আপনাকে চল্লিশ হাযার দিরহাম হাদিয়া দিতে চাচ্ছি, এটা আপনার প্রয়োজনে কাজে লাগাবেন'। তিনি বললেন, 'যাদের প্রতি আপনি অন্যায় করেছেন, এটা তাদেরকে দিয়ে দিন'। গভর্নর বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি মীরাছ সূত্রে সেটা পেয়েছি, সেখান থেকেই আপনাকে দিচ্ছি'। তিনি বললেন, 'আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার কাছ থেকে এগুলো সরান, আপনার কাছে থেকেও আল্লাহ এগুলো সরিয়ে রাখুন'। এবার গভর্নর বললেন, 'যদি অন্য কিছু দেই, নেবেন তো?' তিনি বললেন, 'দিতে পারেন, যদি দ্বীনের ব্যাপারে কোন ক্ষতি না হয়'। তখন গভর্নর বললেন, 'এগুলো নিয়ে আপনি মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিবেন'। হাম্মাদ (রহঃ) বললেন, 'বণ্টন তো ঠিকই করতে পারি। কিন্তু আমি ইনসাফ বজায় রাখলেও কেউ হয়ত না পেয়ে বলবে আমি ইনছাফ করিনি, তখন সে গুনাহগার হবে। সুতরাং এগুলো আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিন। আল্লাহ আপনাকে এসবের বোঝা থেকে মুক্ত করুন'।[১৭] অল্পে তুষ্টি এমন বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। আল্লাহ আমাদেরকে এখান থেকে উপদেশ হাছিল করার তাওফীক্ব দান করুন।

(৩) সমকালীন কতিপয় মনীষী অল্পে তুষ্টির গুণে নিজেদের জীবনকে গুণান্বিত করেছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হ'লেন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ)। তিনি ছিলেন মৌরিতানিয়া বংশোদ্ভূত একজন দুনিয়া বিমুখ আলিমে দ্বীন ও বিদগ্ধ মুফাসসির। আব্দুল আযীয বিন বায, ছালেহ আল-উছায়মীন, ড. বকর আবূ যায়েদ (রহঃ), ছালেহ আল-ফাওযান (হাফিঃ) -সহ সঊদী আরবের বহু প্রসিদ্ধ আলিম তার ছাত্র ছিলেন।

শানক্বীত্বী (রহঃ) ছিলেন অল্পে তুষ্ট জীবনের মূর্ত প্রতীক। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'আব্বা আমাদের নিয়ে মদীনায় থাকতেন। একবার তাঁর হাত খালি হয়ে যায়। তাঁর কাছে কোন টাকা ছিল না। একজন প্রতিবেশী এটা বুঝতে পেরে তাকে কিছু সম্পদ ঋণ দেওয়ার ওয়াদা করে। তিনি যখন সেই প্রতিবেশীর কাছে ঋণ নিতে গেলেন। দেখলেন, ঋণ দিতে আগ্রহী লোকটা অতি সাদামাটা পোশাক পরিধান করে গৃহস্থলী কাজ-কর্ম করছেন। আব্বা এটা দেখে ঋণ না নিয়েই বাসায় ফিরে আসলেন। তাকে দেখে মনে হ'ল- যেন তার কোন উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তিনি আমাদের কাছে সেই প্রতিবেশীর বিবরণ পেশ করে বলেন, 'আমি তাকে দেখে নিজের অজান্তেই রাস্তার ধূলা-বালির ওপরে সিজাদয় পড়ে গেলাম। সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সাথে সাথে আমার হৃদয়জুড়ে কি যে খুশি ও প্রশান্তির বাতাস দোলা দিয়ে গেল- তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মনে মনে বললাম, আমি কিভাবে দুনিয়া কামনা করতে পারি, অথচ আমার রব আমাকে ইলমের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, তাঁর কিতাব অনুধাবন করার তাওফীক্ব দিয়ে আমাকে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন? তখন আমি অনুভব করলাম, আল্লাহ আমাকে কুরআনের মর্ম অনুধাবনের যে নে'মত দান করেছেন, তা দিয়ে পুরো দুনিয়া পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে আর কারো কাছে কোন কিছু চাওয়ার আগেই মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা দিয়ে আমার হৃদয়ে অভাবের দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং আমাকে সম্মান ও মর্যাদার চাদরে আবৃত করে নিলেন। তাই আমি ঋণ না নিয়েই চলে আসলাম'।

শায়খের ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, আমার আব্বা দুনিয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন এবং আমাকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, احذر من الدنيا؛ فإنها كالماء المالح، والشيطان يكذب عليك ويقول: اجمع الأموال لتتصدق بها، وتبني بها المدارس، وتعمل بها الأربطة. وهو يكذب عليك يريد أن يضيع وقتك، فإذا جمعت المال لا أنت تعطيه للناس، ويشغلك عن عبادة الله، فهذا شيطان يريد أن يصرفك عن ما هو خير لك، 'দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান থাক! কেননা দুনিয়াটা লবণাক্ত পানির মতো। শয়তান তোমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বলবে, তুমি সম্পদ সঞ্চয় করো, যাতে সেই সঞ্চিত সম্পদ দিয়ে দান-ছাদাক্বাহ করতে পার, মাদ্রাসা

১৭. *ইমাম নববী, বুস্তানুল 'আরেফীন (কায়রো: দারুর রাইয়ান লিত তুরাছ, তাবি) পৃ. ৩৫-৩৬।*

নির্মাণ করতে পার এবং আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পার। সে তোমাকে আরো মিথ্যা অভয় দিবে এবং চাইবে, তুমি যেন (সম্পদ সংগ্রহে) তোমার সময় অপচয় করে ফেল। কিন্তু যখন তুমি সম্পদ সঞ্চয় করে ফেলবে, তখন তুমি আর মানুষের জন্য দান করতে চাইবে না এবং সেই ধন তোমাকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে গাফেল করে ফেলবে। এভাবেই শয়তান তোমাকে কল্যাণকর বিষয় থেকে নিবৃত্ত রাখতে সচেষ্ট থাকে'।[১৮]

ড. মুহাম্মাদ খাযর নাজী বলেন, একবার শায়খ শানক্বীত্বীকে চিকিৎসার জন্য কায়রো নিয়ে আসা হয়। সঊদী দূতাবাস থেকে সরকারীভাবে তার চিকিৎসা বাবদ যাবতীয় খরচের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। যখন চিকিৎসা শেষ হয়ে যায়, তখন কিছু অর্থ বেঁচে যায়। তিনি দূতাবাসে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ ফিরিয়ে দেন। পরে দূতাবাসের একজন প্রতিনিধি তার কাছে এসে সেই অর্থ পুনরায় তাকে দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং বলেন, 'হে শায়খ! সরকার এই অর্থ আপনার জন্য বরাদ্দ করেছে এবং এটা আপনারই প্রাপ্য'। তখন শায়েখ বলেন, তাহ'লে এটা আমার পক্ষ থেকে চিকিৎসা বাবদ অন্য কাউকে দিয়ে দাও। আমার চিকিৎসা তো শেষ। সুতরাং এটা গ্রহণ করা আমার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়'।[১৯]

(৪) সমকালীন মনীষীদের মাঝে আরেকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হ'লেন আল্লামা মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মিন (রহঃ)। তার জীবনটা অল্পে তুষ্টির স্বচ্ছ সলিলে বিধৌত ছিল। তার জীবনী থেকে দু'টি উপদেশমূলক ঘটনা তুলে ধরা হ'ল-

শায়খ উছায়মীন (রহঃ)-এর ছাত্র সুলাইমান বিন সালেম আল-হানাকী (রহঃ) বলেন, একদিন শায়খ উছায়মীন (রহঃ) মসজিদের বারান্দায় বসে তার ছাত্রদের সামনে দারস দিচ্ছিলেন। ছাত্ররা তাকে বিভিন্ন শারঈ মাসায়েলের ব্যাপারে প্রশ্ন করছিল, আর তিনি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমতাবস্থায় একটি আলিশান গাড়ি মসজিদ চত্বরে প্রবেশ করল। চালক গাড়ি থেকে নেমে শায়খের কাছে আসল এবং শহরের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলল, 'তিনি এই গাড়িটি আপনাকে হাদিয়া দিয়েছেন'। এই কথা বলে সে শায়েখের কাছে গাড়ির চাবি দিতে হাত বাড়াল। কিন্তু তিনি চাবি নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু চালক পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তাই শেষ পর্যন্ত চাবিটা নিলেন।

লোকটা চলে গেলে তিনি চাবিটা পাশে রেখে আবার ছাত্রদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। কিন্তু চাবির দিকে একবারও তাকালেন না। এভাবে দরস চলতে থাকল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ এক যুবকের আগমন ঘটল। সে শায়খকে সালাম দিয়ে আরয করে বলল, 'শায়খ! আজ রাতে আমার বিবাহ সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ। আমি মনে প্রাণে কামনা করি যে, আপনি আমার বিবাহে উপস্থিত থাকবেন'। শায়খ ওযর পেশ করে সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তার উপস্থিতির জন্য যুবকটি পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তখন শায়খ তার প্রতি কোমল হয়ে বললেন, 'আসলে পরিস্থিতি অনুকূলে হচ্ছে না। তাছাড়া আমি তোমার বিবাহে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতাম। তুমি এক কাজ কর, এই গাড়ির চাবিটা নাও! এটা আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উপহার দিলাম। যুবক চাবিটা হাতে নিল এবং গাড়ি নিয়ে চলে গেল। এরপর শায়খ আবার ছাত্রদের সামনে কথা বলা শুরু করলেন। তিনি আগের মতো একদম স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে থাকলেন। যেন কিছুই হয়নি।[২০]

সুলায়মান হানাকী (রহঃ) আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার সঊদী আরবের তৎকালীন বাদশাহ খালিদ এবং যুবরাজ ফাহাদ শায়খ উছায়মীন (রহঃ)-এর বাড়িতে তাকে দেখতে যান।

ঘরের অনাড়ম্বর কাঠামো দেখে বাদশাহ তাকে একটি নতুন বাড়ি উপহার দেওয়ার ইচ্ছা করলেন এবং তাকে একটি প্রাসাদ তৈরি করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। উত্তরে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বললেন, 'আমি আপনার প্রস্তাবের সমাদর করি, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন! তবে ইতিমধ্যেই আমি ছালিহিয়া (উনাইযা শহরের একটি এলাকা)-তে একটি বাড়ি নির্মাণ করছি'। বাদশাহ তার জন্য কিছু একটা করতে চাচ্ছিলেন, তখন শায়খ বললেন, 'যদি আপনি কিছু করতেই চান, তাহ'লে দয়া করে আমার ছাত্রদের বসবাসের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ করে দিন, অন্যথা তারা মসজিদে বসবাস করছে, আর এটি তাদের জন্য খুব কষ্টকর'। বাদশাহ চলে যাওয়ার পরে, ছাত্ররা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'শায়খ! আমরা তো জানতামই না যে আপনি ইতিমধ্যে ছালিহিয়াতে একটি বাড়ি নির্মাণ করছেন?' জবাবে তিনি বললেন, 'তোমরা কি জাননা, ছালিহিইয়াতে একটি কবরস্থান আছে?' তারা বলল, 'জ্বী'। তিনি বললেন, 'আমি সেখানেই আমার পরকালের বাড়ি নির্মাণ করছি'।[২১]

ফেৎনা বিদগ্ধ এই সামাজিক পরিবেশে জীবনের রঙ যখন ধূসর হয়ে যায় এবং লোভের ক্রমাগত ঝাপটায় হৃদয় তরী দিকভ্রান্ত হয়ে যায়, তখন সৎকর্মশীল সালাফদের জীবনী নিঙড়ানো এই টুকরো কাহিনীগুলো প্রশান্তির বারি দিয়ে আমাদের হৃদয়কে সজীব-সিক্ত করবে এবং সীরাতে মুস্তাক্বীমে অটল থাকতে প্রেরনা জোগাবে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁদের প্রতি রহম করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে তাঁর নেককার বান্দাদের পথে পরিচালিত করুন- আমীন!

[ক্রমশঃ]

---

১৮. আব্দুল আযীয তুইয়ান, যুহূদুশ শায়খ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী ফী তাক্বরীরি আক্বীদাতিস সালাফ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল 'উবাইকান, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯হি./১৯৯৯খ্রি.) ১/৩৮-৩৯।

১৯. প্রাগুক্ত, ১/৩৯।

২০. আছেম বিন আব্দুল মুন'ইম আল-মারী, আদ-দুরারুছ ছামীন ফী তারজামাতি ফাক্বীহিল উম্মাহ আল্লামাহ ইবনু উছায়মীন (আলেকজান্দ্রিয়া, মিসর: দারুল বাছীরাহ, ১৪২৪হি./২০০৩খ্রি.) পৃ. ২১৮।

২১. আদ-দুরারুছ ছামীন, পৃ. ২১৮-২১৯।

ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য[১]

মূল : এমএ এম শুকরী[২]*

*অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব***

সাহিত্য সবসময় মানব সমাজে একটি জীবন্ত ও গতিশীল শক্তি হিসাবে বিরাজ করেছে। কেবল মানুষের নান্দনিক অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসাবেই নয়, বরং ইতিহাসের কোন কোন পর্যায়ে তো এটা সমাজ পরিবর্তনেও ভূমিকা রেখেছে। বৃহত্তর পরিসর থেকে দেখলে, সাহিত্য কেবল মানুষের সৌন্দর্যবোধ, নান্দনিক অনুভূতি আর কল্পনার বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এতে সংশ্লিষ্ট সমাজের নানা ছবি ফুটে ওঠে। যদিও প্রত্যেকটি জাতির ইতিহাসের একটা পর্যায়ে দেখা যায় 'শিল্পের নিমিত্ত শিল্প'-ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছে এবং পরবর্তীতে এটা শিল্প-সাহিত্যের জগতে একটা শক্তিশালী দর্শন হিসাবে টিকে থেকেছে। তবুও সাহিত্যের যে একটা সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে, তা কোন সাহিত্য সমঝদার বা চিন্তাশীল বিশ্লেষক অস্বীকার করেননি। যাইহোক, মার্ক্সবাদ[৩], ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, অস্তিত্ববাদ[৪]-সহ নানা মতবাদ ও দর্শন সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। ১৯১৭-এ রুশ বিপ্লবের পর, রাশিয়া ও তার অধীন অন্য দেশগুলো সাহিত্যের সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে জটিল করে ফেলল। যেমন তাদের নিকট সাহিত্যের সামাজিক ও নৈতিক দিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। ফলে সেসময়ের সব সাহিত্যকর্ম সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের[৫] লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত হ'ল, যেখানে সামাজিক সম্প্রদায় গঠনে সাহিত্যের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখা হ'ল।

ইসলামে সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। ফলে 'শিল্পের নিমিত্ত শিল্প'[৬] ধারণাটি ইসলামী সাহিত্যচিন্তার সাথে কোনমতেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, সাহিত্যের ভূমিকাকে ইসলামের প্রচলিত জ্ঞানতত্ত্বের বাইরে থেকে দেখাই ভাল। কেননা ইসলামে জ্ঞান মোটাদাগে দুই ভাগে বিভক্ত। অর্জিত জ্ঞান আর অহীর জ্ঞান। সাহিত্য যদিও অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে পড়ে, তবুও এটা সামাজিক বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত অর্জিত জ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে ভিন্ন। এটাকে বরং অহীর জ্ঞানের কাছাকাছি বলা যায়, কারণ সাহিত্য-দক্ষতা সহজাত অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভরশীল।[৭]

যদিও ব্যক্তির সহজাত অনুভূতি থেকেই নান্দনিক অভিজ্ঞতা আর শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব ঘটে, তবুও সেই অনুভূতি প্রকাশকালে সাহিত্য এক নতুন মাত্রা ধারণ করে এবং সংশ্লিষ্ট সমাজের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। সাইয়েদ কুতুবের মতে, 'শিল্পের অন্যান্য শাখার মতো সাহিত্যও হচ্ছে আবেগ-অনুভূতি আর মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। মূল্যবোধ আবার স্বয়ং শিল্পীর চৈতন্যের সাথে বোঝাপড়ায় লিপ্ত হয়। এই মূল্যবোধ ব্যাপারটি কিন্তু যুগের দাবি অনুযায়ী বা ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা অনুসারে বদলে যায়। তবে এটা সর্বক্ষেত্রেই একজন মানুষ এই মহাবিশ্বকে, মহাবিশ্বে মানুষের অবস্থানকে এবং সর্বোপরি মানবজীবনকে কিভাবে মূল্যায়ন করছে, তার উপর নির্ভর করে। সুতরাং শিল্প-সাহিত্যকে মূল্যবোধ থেকে আলাদা করে দেখাটা হাস্যকর, কেননা সেগুলো হচ্ছে খোদ মূল্যবোধের বাহ্যিক রূপ। এমনকি কেউ যদি এই আলাদাকরণে সফলও হয়, তাহ'লে বলতে হয় যে, এক্ষেত্রে সে কেবল কতিপয় শব্দ আর বাক্যের মুখোমুখি হবে, যা কোন অর্থ বহন করে না। এমনিভাবে ব্যক্তি বা সমাজের মূল্যবোধকে সামগ্রিক জীবনদর্শন থেকে আলাদা করাটাও অর্থহীন। ওমর খৈয়ামের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে সাইয়েদ কুতুব নিজের বক্তব্য সমর্থন করেছেন, কারণ ওমর খৈয়ামের কবিতা ছিল তার জীবনবোধ হ'তে উৎসারিত।[৮]

ইসলাম মানুষকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করে। ফলে তার কোন কাজই সমাজের উপর প্রভাব ফেলা

*** শিক্ষার্থী, ইংরেজী বিভাগ (২য় বর্ষ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *TOWARDS AN ISLAMIC THEORY OF LITERATURE Author(s): M. A. M. SHUKRI Source: Islamic Studies , Winter 1992, Vol. 31, No. 4 (Winter 1992), pp. 411-421, Published by: Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad Stable URL: https://www.jstor.org/stable/20840093*

২. *এম এ এম শুকরি: (জন্ম.১৯৪০- মৃত্যু. ১৯ মে ২০২০ খ্রি.) একজন শ্রীলঙ্কান মুসলিম বিদ্বান। তিনি ১৯৭৩ সালে কমনওয়েলথ বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৯৭৬ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাজ্য) হ'তে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। পেরাদেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (শ্রীলংকা) এ্যারাবিক অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি ১৯৮২ সাল হ'তে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায় চার দশক যাবৎ শ্রীলংকায় ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র 'নালীমিয়াহ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ'-এর পরিচালক পদে আসীন ছিলেন। তিনি আরবী, ইংরেজী, তামিল ও সিংহলী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে 'মুসলিমস অব শ্রীলংকা', 'রেলিজিওন অ্যান্ড সায়েন্স', 'ইসলাম অ্যান্ড এজুকেশন' প্রভৃতি।-অনুবাদক*

৩. *মার্ক্সবাদ (Marxism): কার্লমার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.)-প্রদত্ত একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্ব। এ তত্ত্ব মতে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতই হ'ল ইতিহাসের প্রধান চালিকাশক্তি, একসময় এমন একটি সমাজ কায়েম হবে, যেখানে কোন শ্রেণী বিভাজন থাকবে না।-অনুবাদক*

৪. *অস্তিত্ববাদ (Existentialism): এ তত্ত্ব মতে, নির্লিপ্ত ও প্রতিকূল বিশ্বে মানুষ এক অনন্য নিঃসঙ্গ প্রাণী, যে নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং নিজ নিয়তি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীন।-অনুবাদক*

৫. *সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ (Socialist realism): এটি এক ধরনের শিল্পশৈলী, যা সোভিয়েত রাশিয়ায় শুরু হয় এবং ১৯৩২-৮৮ সাল পর্যন্ত সেদেশে আনুষ্ঠানিক শিল্পরীতি হিসাবে স্বীকৃত ছিল। এই শৈলী মতে, শিল্পে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে নৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা-উপাদান থাকা দরকার, যাতে সাধারণ মানুষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারে সচেতন হয়।-অনুবাদক*

৬. *শিল্পের নিমিত্ত শিল্প (Art for Art's Sake): এটি একটি উনিশ শতকের ফরাসি শ্লোগান। এ মতে, একটি সত্যিকার শিল্পকর্ম যে কোন ধরনের নৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষামূলক বিষয় থেকে মুক্ত।-অনুবাদক*

৭. *সাইয়েদ আলী অ্যা আশরাফ 'লিটারেরি এডুকেশন অ্যান্ড রিলিজিয়াস ভ্যালু: দি ইসলামিক প্রোচ', মুসলিম এডুকেশনাল কোয়ার্টারলি, ভলিউম. ১, নং ৪, পৃ. ৫৫।*

৮. *সাইয়েদ কুতুব, ফিত তারীখ ফিকরাহ ওয়া মিনহাজ (বৈরুত, ১৯৭৮), পৃ. ১৩-১৬।*

www.at-tahreek.com

থেকে মুক্ত নয়। মানুষের প্রতিটি কাজেরই ব্যক্তিগত এবং সামাজিক- দুই ধরনের গুরুত্ব রয়েছে। যাহোক, সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকাটি বর্তমানে, বিশেষত মুসলিম সমাজে এক নতুন মাত্রা ধারণ করেছে। কারণ একদিকে মানুষের মূল্যবোধ আর দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা বেড়েই চলেছে, অপরদিকে সাহিত্য, যার কিনা রয়েছে শব্দের জাদু আর মায়া। তা তরুণদেরকে মূল্যবোধ আর চিন্তাজগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। এক্ষণে যেহেতু 'ধ্বংসাত্মক সাহিত্যে'র জোয়ার দিন দিন বেড়েই চলেছে, যা কিনা সমাজের নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ-মূল্যবোধ সবকিছুর জন্য ক্ষতিকর, তাই একজন মুসলিম কিভাবে তার নান্দনিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটাবে, সে ব্যাপারে কুরআনী নির্দেশনা-ভিত্তিক মানদণ্ড নির্ধারণ করা সময়ের দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রেনেসাঁ-পরবর্তী সময়ে যে বস্তুবাদী-মানবতাবাদী দর্শন বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে আর সামাজিক ক্ষেত্রে ছড়ি ঘুরিয়ে এসেছে, সেটার কবলে পড়ে, কি প্রাকৃতিক ধর্ম কি আসমানী ধর্ম, সব ধর্মচিন্তায় মানুষের এক বিকৃত ও খণ্ডিত চিত্র জায়গা করে নিয়েছে। ফলে আজকের দিনে মানুষের কোন সর্বজনগ্রাহ্য আধ্যাত্মিক পরিচয় নেই। আর তাই ফ্রয়েডের কাছে মানুষ হ'ল কেবলই এক জৈবিক সত্ত্বা, যে তার প্রবৃত্তির তাড়নার কাছে পরাস্ত। ডারউইনের নিকট মানুষ হ'ল প্রকৃতির অংশবিশেষ। মার্ক্সের মতে, মানুষ হ'ল সামাজিক আর অর্থনৈতিক শক্তির ফলাফল। আর বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ[৯] তো মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরমাণুর দৈববিন্যাসের ফল হিসাবে বিবেচনা করে।

মানুষের এই বিকৃত সত্তার হাত ধরে, পশ্চিমা-বস্তুবাদী দর্শনে ভর করে এমন এক সাহিত্যের জন্ম হ'ল যার বিকাশে ব্যক্তি ও পরিবারের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। অতঃপর সেই সাহিত্যের কৃত্রিম আধ্যাত্মিকতা মানুষের জীবনের মহান আদর্শটাই ছিনিয়ে নিল। আর এভাবে তার জীবনকে গভীর শূন্যতা আর হতাশায় ডুবিয়ে দিল। টি.এস.ইলিয়ট (১৮৮৬-১৯৬৪) তার "The Hollow Men" কবিতায় কথিত মানবতাবাদী সাহিত্যে গড়া সেই 'খণ্ড মানবের' এক জীবন্ত ছবি এঁকেছেন।

"আমরা সব ফাঁপা মানুষ
আমরা সব ঠাসা মানুষ
ঠেস দিয়ে এ ওর গায়ে
মাথার খুলি খড়ে ঠুসে! হায়রে!
যখন ফিসফিসিয়ে আলাপ করি
আমাদের শুকনো গলা শোনায়
চাপা অর্থহীন
যেন শুকনো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস
কিংবা যেন আমাদের শরাবখানার ফাঁকা ভাঁড়ারে
ভাঙা কাচের উপর ইঁদুরের আনাগোনা
রূপহীন কিমাকার, বর্ণহীন ছায়া,
পক্ষাঘাতগ্রস্ত বেগ, অঙ্গভঙ্গি নিশ্চল;
যারা পার হয়
প্রত্যক্ষ নয়নে যারা মরণের
পরপারে যায় অলকায়
তারা আমাদের মনে রাখে
যদি রাখে মনে রাখে
শুধু ফাঁপা মানুষ ফাঁকা মানুষ হ'লে।[১০]

এবার মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমের রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম হ'ল, আর সেই সাথে পশ্চিমা শিক্ষা বিস্তারের ফলে মুসলিম বিশ্ব সর্বক্ষেত্রে পশ্চিমা সংস্কৃতির গ্রাস হ'ল। যেহেতু সাহিত্য-সংস্কৃতি হচ্ছে শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই মুসলিম বিশ্ব এবার ত্বরিত গতিতে পশ্চিমা সাহিত্যের শিকার হ'ল এবং সময়ের আবর্তে এও দেখা গেল যে পশ্চিমা, সাহিত্যদর্শনে মুগ্ধ কবি ও লেখকেরা পশ্চিমা লেখকদের অনুকরণ করতে শুরু করল। পরিণতিতে তাদের হাতে এমন এক সাহিত্যের জন্ম হ'ল, যা কিনা মুসলিম বিশ্বের চিরাচরিত মূল্যবোধের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। এমনকি এক পর্যায়ে দেখা গেল, পশ্চিমা সাহিত্যধারা মুসলিম বিশ্বে এত প্রবল হ'ল যে মার্ক্সবাদ, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব এবং অস্তিত্ববাদের মতো পশ্চিমা দর্শন-নির্ভর সাহিত্য খোদ মুসলিম বিশ্বে তার জয়গান শুনতে পেল। আর এভাবেই মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এক গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি হ'ল।

অবশেষে ইসলামী চিন্তার যে পুনর্জাগরণ ঘটল, ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর তার নানাবিধ প্রভাব ছিল। ইসলামী রেনেসাঁর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল, পশ্চিমা দর্শন-নির্ভর আত্মা-বিধ্বংসী সাহিত্যের কুপ্রভাব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং সাথে সাথে তারা ইসলামী সাহিত্যধারায় সিক্ত এবং ইসলামী মূল্যবোধে-পুষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা। সাইয়েদ কুতুব ও সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীকে ইসলামী সাহিত্য জগতে অগ্রদূত হিসাবে বিবেচনা করা যায়। সাইয়েদ কুতুব তার 'ফীত-তারীখ ফিকরাতুন ওয়া মিনহাজুন' গ্রন্থে ইসলামী সাহিত্যের একেবারে মৌলিক ও প্রয়োজনীয় দিক তুলে ধরেছেন। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী তার 'মুখতারাত মিন আদাবিল আরাব' গ্রন্থে ইসলামী সাহিত্য প্রসঙ্গে তার নিজস্ব ভাবনা তুলে ধরেছেন। অবশ্য একাডেমী অব এ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ, দামেশক-এর সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর, তিনি সেখানে ইসলামী সাহিত্যের উপর একটি গবেষণাপত্র পাঠিয়েছিলেন। এছাড়াও নাজীব কায়লানী তাঁর 'আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়াল-মাসাহীব আল-আদাবিয়্যাহ'

৯. *বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ (Scientific Humanism): এ তত্ত্ব মতে, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে মানুষের জীবনকে অধ্যয়ন করতে হবে। আর এভাবে মানুষকে সমৃদ্ধির পথে চালিত করা সম্ভব।-অনুবাদক*

১০. *বিষ্ণু দে অনূদিত, এলিঅটের কবিতা (২০১৫), আনন্দ পাবলিশার্স (ভারত), ২য় মুদ্রণ, পৃ. ৩৫।-অনুবাদক*

www.at-tahreek.com

গ্রন্থে এবং ইমাদুদ্দীন খলীল তাঁর 'ফিন-নাকদিল ইসলামী আল-মু'আছির' গ্রন্থে এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। মুহাম্মাদ কুতুবও বিভিন্ন বক্তৃতা-গবেষণার মাধ্যমে ব্যাপক কাজ করেছেন। তিনি তাঁর 'মানহাজুল ফান্নিল ইসলামী' গ্রন্থে ইসলামী সাহিত্যতত্ত্ব ও ইসলামী নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন।

পূর্বোল্লিখিত মুসলিম মনীষীদের অমূল্য অবদানের ফলে উম্মতের সার্বিক অঙ্গনে এই মর্মে সচেতনতার জোয়ার সৃষ্টি হ'ল যে, ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও সাহিত্যচিন্তার আলোকে একটি ইসলামী সাহিত্যধারার বিকাশ ঘটাতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, বিকল্প ইসলামী সাহিত্যের ব্যবস্থা না করে, 'ধ্বংসাত্মক সাহিত্য' মুসলিম সমাজকে নষ্ট করে ফেলল, কেবল এটা বলে চিৎকার করে কোন লাভ নেই। ফলে যখন মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে এবং ইসলামী সাহিত্যের একটি অবকাঠামো তৈরী হবে, কেবল তখনই মুসলিম বিশ্ব উৎকৃষ্ট সাহিত্য জন্মদানের জন্য প্রস্তুত হবে। যে সাহিত্য কিনা সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামী সাহিত্য চিন্তা থেকে উৎসারিত। অতঃপর উত্তম ও উপকারী সাহিত্য বাছাই করার জন্য ইসলামী মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিকতার আলোকে নীতিমালা প্রণয়ন করা যরূরী হবে। ইসলামী নন্দনতত্ত্বনির্ভর এসব মূলনীতি মুসলিম শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্য পথনির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে। নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানসহ অন্যান্য সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামী মানদণ্ড নির্ধারণ করা যেমন যরূরী, ঠিক তেমনিভাবে ইসলামী নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনাকে সুসংবদ্ধ করাটাও যরূরী। লামিয়া ফারূকীর ভাষায়, 'সমকালীন মুসলিমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক্ষণে তারা যদি তাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদের ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রকৃত উৎস থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে তাহ'লে তারা হয় সাংস্কৃতিক বিলুপ্তির মুখে পড়বে, না হয় চরম গোঁড়ামির সাগরে হাবুডুবু খাবে। শিল্পকর্ম বিচারের ক্ষেত্রে এই বিকল্পসত্তা ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। মুসলিমদের নান্দনিক উৎকর্ষ আসলে তাদের সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচায়ক'।[১১]

মক্কায় অনুষ্ঠিত 'ইসলামী শিক্ষা'-শীর্ষক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে[১২] সাহিত্য প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত সুফারিশ করা হয়। 'ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনার জন্যে একটি খাঁটি ইসলামী প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে হবে, যেটা কিনা মুসলিমরা যে বিভিন্ন ঘরানার সাহিত্যের সংস্পর্শে আসছে, তা মূল্যায়নের জন্যে মানদণ্ড প্রদান করবে'।[১৩]

প্রথম সম্মেলনের পর থেকে, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নদওয়াতুল উলামা'র পৃষ্ঠপোষকতায় মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী ভারতের লক্ষ্ণৌতে ইসলামী সাহিত্যের উপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইসলামী সাহিত্যের নানা দিক সম্বলিত গবেষণাপত্র সেখানে পেশ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, সেই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে 'রাবেতাতুল আদাবিল ইসলামী' আত্মপ্রকাশ করে। এক্ষেত্রে আলী আশরাফের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এ প্রসঙ্গে তিনি মুসলিম এডুকেশনাল কোয়ার্টারলি (কেমব্রিজ)-এ অনেকগুলো নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

ইসলামী সাহিত্যের এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অত্র নিবন্ধ, যে মূলনীতিগুলো ইসলামী সাহিত্যের নির্মাণকাঠামো হিসাবে কাজ করবে, সেগুলোকে চিহ্নিতকরণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য ধারণাটিকে আরো পরিষ্কার করবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী সাহিত্য হ'ল ইসলামের সৌন্দর্যভাবনা বা ইসলামী নন্দনতত্ত্বেরই বর্ধিতরূপ। এটি এই অর্থে যে, সাহিত্য হ'ল মানুষের নান্দনিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। আর এই বহিঃপ্রকাশ ঘটে মুখে বলা বা লেখার মাধ্যমে। মানবজীবনে সৌন্দর্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য-বস্তু অবলোকন করে তা মূল্যায়ন করার এক সহজাত প্রবণতা রয়েছে। নান্দনিক-অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত, আর তাই এটাকে বলা হয় ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা। 'Aesthetics' (নন্দনতত্ত্ব) শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে গ্রীক শব্দ Aesthesis থেকে। যার অর্থ হ'ল 'ইন্দ্রিয় জ্ঞানতত্ত্ব। অন্যভাবে বললে 'সংবেদনশীলতা'।[১৪] যাইহোক, ইসলামী সৌন্দর্যবোধ কেবল ইন্দ্রিয়সুখেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইসলামে সৌন্দর্যতত্ত্বের একটি ব্যাপক ও গভীর অর্থ রয়েছে। ইসলামী নন্দনতত্ত্ব, সত্যিকার অর্থে রাসূলের (ছাঃ) একটি হাদীছের উপর নির্ভরশীল, 'আল্লাহ সুন্দর, আর তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন'।[১৫] স্পষ্টত, আল্লাহ্‌র একটি ছিফাত হ'ল সৌন্দর্য (জামাল)। ফলে একজন মুসলিমের নিকট থেকে এটা প্রত্যাশা করা হয় যে, সে তার নিজের মধ্যে ইলাহী ছিফাত লালন করবে- 'তাখাল্লাকূ বি আখলাকিহী' (তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ছিফাত লালন করো)। এভাবে একজন মুসলিম সৌন্দর্যপ্রেমীও বটে। কিন্তু তার সৌন্দর্য-অনুভূতি কেবল ইন্দ্রিয়সুখ বা স্থূল আবেগে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সৌন্দর্য সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে। এভাবে সৌন্দর্যকে অতি লৌকিক উপায়ে অনুভব করার মাধ্যমে একজন মানুষ তার প্রবৃত্তি তাড়নার উর্ধ্বে আরোহণ করে। ফলে তার কামানুভূতি দমিত হয়।

১১. *লুই লামিয়া আল-ফারুকী, ইসলাম অ্যান্ড আর্ট (লাহোর, ১৯৮২), পৃ.১৩।*
১২. *এটি ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়।-অনুবাদক*
১৩. *সাইয়েদ হুসাইন নছর (সম্পাদক), ফিলোসোফি, লিটারেচার অ্যান্ড ফাইন আর্টস (১৯৮২), পৃ.১১৬।*
১৪. *তোসান বেইরাক, 'আর্ট: দি ইসলামিক অ্যাপ্রোচ', মুসলিম এজুকেশনাল কোয়ার্টারলি, ভলিউম. ১, নং. ৪, পৃ. ৩০।*
১৫. *মুসলিম হা/৯১।*

www.at-tahreek.com

এ প্রসঙ্গে প্রাচ্যের সৌন্দর্য-ভাবনার আলোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'একটি শিল্পকর্ম কোন সৌন্দর্য-পণ্য নয়; বরং ওতে নিহিত সৌন্দর্য শিল্পের প্রকাশে সহায়ক মাত্র। মোটেই শিল্পের পরম বা মুখ্য বস্তু নয়'।[১৬] যাইহোক সৌন্দর্যের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা বলেছেন, ইসলামের সৌন্দর্যভাবনা তার চেয়েও সমৃদ্ধ। সৃষ্টিতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তার সাথে নন্দনতত্ত্ব পুরোপুরি মিলে যায়।

সৌন্দর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন: বিন্যাস, অনুপাত, সামঞ্জস্য এবং শব্দে-বর্ণে-ছন্দে-লয়ে ভারসাম্য- এসব আসলে ইলাহী ছিফাত- সৌন্দর্য (জামাল)-এর বহিঃপ্রকাশ। যেমন আল্লাহ বলেন,

'তুমি তোমার মহান রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুবিন্যস্ত করেন' *(আ'লা ৮৭/১-২)*।

'তিনি আসমান ও যমীন যথার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন- 'তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভিত এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট' *(তাগাবুন ৬৪/৩)*।

"আমি নিকটবর্তী আসমানকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি' *(ছাফফাত ৩৭/৬)*।

এমনকি ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের মতো ভারবাহী পশুর ব্যাপারেও কুরআন শুধু কাজের কথাই নয়, বরং সৌন্দর্যের কথাও বলেছে। যেমন-

'তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভাবর্ধনের জন্য তিনি ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর সৃষ্টি করেছেন' *(নাহল ১৬/৮)*।

সূরা আন'আমে আল্লাহ শাকসবজি ও ফলফলাদির কথা উল্লেখ করে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন টাটকা ও পাকা ফলের সৌন্দর্য উপভোগ করে। আর আল্লাহ্র সৃষ্টিমহিমা নিয়ে গবেষণা করে।

মুহাম্মাদ কুতুব তাঁর 'মানহাজুল ফান্নিল ইসলামী'[১৭] গ্রন্থে ইসলামী নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। কুরআনের সৌন্দর্যভাবনা সবকিছুকেই শামিল করে। এটা কেবল বস্তুর মধ্যেই নয়, বরং আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা ও কর্মের মধ্যেও সৌন্দর্য তালাশ করে। যেমন কথা বলায় সৌন্দর্য- আহসানু কাওলান (৪১:৩), কাজে সৌন্দর্য- আহসানু আমালান (১১:৮), নছীহতে সৌন্দর্য- মাওয়িযাতুল হাসানাহ (১৬:১২৫), বিতর্কে সৌন্দর্য- জাদিলহুম বিল্লাতী হিয়া আহসান (১৬:১২৫)- কুরআন সবকিছুর মধ্যে সৌন্দর্য তালাশ করে। এটি নবী ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনিকে সর্বোত্তম বর্ণনা হিসাবে অভিহিত করেছে- আহসানাল ক্বাছাছ (১২:৩)। অতএব আমরা দেখতে পাই, ইসলামের সৌন্দর্যবোধ কেবল স্পর্শগ্রাহ্য বস্তুতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটা মানুষের আবেগ-অনুভূতি, নীতি-নৈতিকতার মত বিষয়কেও শামিল করে।

যেমনটা প্রফেসর আলী আশরাফ মনে করেন, 'সত্য ও সৌন্দর্য হ'ল আল্লাহ্র দু'টি ছিফাত এবং তাঁর ছিফাতের প্রকাশস্বরূপ। এ দু'টো মাখলূকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়'।[১৮] এমনিভাবে জীবনের সত্য ও সৌন্দর্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। এ কারণে নন্দনতত্ত্ব নৈতিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্পষ্টত, ইসলামী সাহিত্য মোটেই মানুষের স্থূল আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং এটি হ'ল মানুষের কুপ্রবৃত্তির (নাফস) সুড়সুড়ি থেকে মুক্ত, শুদ্ধ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। এ সাহিত্য হ'ল আক্বীদা ও আখলাক-ভিত্তিক সাহিত্য। এই আক্বীদাচেতনা থেকেই জন্ম হয় ইসলামী মূল্যবোধের, যা একজন ঈমানদারের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। আর এভাবেই মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপদ্ধতি থেকে উৎসারিত হয় ইসলামী সাহিত্য। এ কারণে এই সাহিত্যকে ঈমান ও আক্বীদা-নির্ভর সাহিত্য হিসাবে বিবেচনা করা যায় *(আদাবুল ঈমান ওয়াল আক্বীদা)*।

ইসলামী সাহিত্য আক্বীদা ও বিশ্বাস-নির্ভর হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, এ সাহিত্য কেবল ধর্মীয় নছীহত আর সাবধানবাণীতে পূর্ণ হবে, বা ধর্মীয় বিষয়-বস্তুতে সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ এমনটা যদি হয়, সেক্ষেত্রে মুসলিম কবি, শিল্পী ও লেখকদের লেখালেখির বিষয়বস্তু সীমিত হয়ে যাবে। একজন মুসলিম সাহিত্যিক মানবজীবনে ঘটে যাওয়া যেকোন বিষয় নিয়ে লিখতে পারেন। এই বিশ্বজগত, জীবনের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না- সবকিছু তার লেখালেখির বিষয়বস্তু হ'তে পারে। তবে এক্ষেত্রে তার কর্তব্য হচ্ছে এগুলোকে সে ইসলামের ছাঁচে ফেলে বিচার করবে। যে শিল্পীর শৈল্পিক সত্তা ইসলামী মূল্যবোধে পুষ্ট, জীবনের কোন ঘটনা যদি তার কাছে শিল্পিত করার যোগ্য বলে মনে হয়, যেটা তার মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তাহ'লে সে তা সানন্দে গ্রহণ করবে। অন্যথা সে তা ছুঁড়ে ফেলে দিবে। উল্লিখিত মানদণ্ড সামনে রেখে, মহাবিশ্ব, মানবজীবনের সার্বিক দিক, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ও বিশালতা- সবকিছুকে একজন মুসলিম শিল্পী তার শিল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। জীবন তার সম্মুখে অফুরন্ত উপাদান পেশ করছে। এমনকি 'প্রেম', যেটা কিনা বিশ্বের অধিকাংশ সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেটাও ইসলামী সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা দখল করে আছে। কেবল প্রকৃতি-প্রেমই নয়, বরং মানবপ্রেম, আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেম, সত্য ও সুন্দরের প্রতি প্রেম এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা- এ সবগুলো ইসলামী শিল্পকর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

---

১৬. *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পার্সোনালিটি (লন্ডন, ১৯৪৮), পৃ. ২৭।*
১৭. *সাইয়েদ মুহাম্মাদ কুতুব, মানহাজ আল-ফান্ন আল-ইসলামী (বৈরুত, ১৯৮০), অধ্যায়. 'আল-জামালু ফিত তাছাওয়ুরিল ইসলাম', পৃ. ৮৫-৯৬।*
১৮. *সাইয়েদ আলী আশরাফ 'লিটারেরি এডুকেশন অ্যান্ড রিলিজিয়াস ভ্যালু: দি ইসলামিক অ্যাপ্রোচ', মুসলিম এডুকেশনাল কোয়ার্টারলি, খণ্ড. ১, নং. ৪, পৃ.৮৪।*

ইসলামী সাহিত্য হ'ল সত্যের (হক্ব) সাহিত্য। এটা মানুষের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে। ফলে ইসলাম মানুষের দোষ-ত্রুটির কথাও স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ বলেন- 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে' *(নিসা ৪/২৮)*। 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে তাড়াহুড়ো-প্রবণ' *(আম্বিয়া ২১/৩৭)*। 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থিরচিত্তরূপে। ফলে তাকে যখন বিপদ স্পর্শ করে, সে হতাশ হয়ে পড়ে। আবার যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়ে যায়' *(মা'আরিজ ১৯-২১)*।

কিন্তু ইসলাম চায়, মানুষ দোষ-ত্রুটি কাটিয়ে ওঠার নিরন্তর সংগ্রামে নিয়োজিত হোক। আর নিশ্চিত করুক যে সত্য, ন্যায়, সুন্দর, সাম্য ও সামঞ্জস্যের মতো সদগুণগুলো সে ধারণ করছে এবং সেগুলো চর্চার মাধ্যমে নিজেকে এক মহোত্তম মানবে রূপান্তর করছে। মানবিক দুর্বলতার প্রতি ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি, কথিত মানবতাবাদী দর্শন-নির্ভর পশ্চিমা সাহিত্যের সাথে তা পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। অস্তিত্ববাদ ও মনঃসমীক্ষণের[১৯] মতো মানবতাবাদী দর্শনগুলো মানুষের দোষ-ত্রুটিকেই বড় করে দেখে। ফলে তাদের হাতে এমন এক সাহিত্যের জন্ম হয় যা যন্ত্রণা, হতাশা আর অসহায়ত্বে ভরা। অস্তিত্ববাদী দর্শনে বিশ্বাসী সাহিত্যিকদের অধিকাংশ সাহিত্যকর্ম ভারসাম্যহীন ব্যক্তিত্বের ফল। আর এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইকবাল বলেন, 'একটি সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে, সে সমাজের কবি-সাহিত্যিকগণ কোন ধরনের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করছেন তার উপর। অনুপ্রেরণা আবার ব্যক্তির ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। এটি হ'ল একটি উপহার, ফলে তা পাওয়ার আগ পর্যন্ত গ্রহীতা এটার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালোমতো জানতে পারে না। এটা ব্যক্তির নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে আগমন করে এবং খোদ ব্যক্তির মাঝে দাখিল হয়ে যায়। এজন্য প্রাপ্ত বস্তু ও তার গুণাবলী মানুষের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ মাত্র একজন অধঃপতিত (decadent) শিল্পীর চেতনা, যদি সে শিল্পী মানুষকে তার শিল্পকর্মের প্রতি প্রলুব্ধ করতে পারে, তাহ'লে তা মানুষের জন্য চেঙ্গিস[২০] ও অ্যাটিলার[২১] সম্মিলিত বাহিনীর চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক হ'তে পারে।[২২]

ভারসাম্যহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী শিল্পী উত্তম গুণাবলীর পরিবর্তে মানুষের দোষ-ত্রুটি বড় করে দেখে। ফলে এমন এক সাহিত্যের জন্ম হয়, ইকবাল যাকে 'অধঃপতিত সাহিত্য' (Literature of decadence) বলে অভিহিত করেছেন। অপরদিকে ইসলাম মানবিক ভুল-ভ্রান্তির কথা স্বীকার করলেও তাকে কিন্তু পাপ-কাম-ঈর্ষাপ্রবণ সত্তা হিসাবে বিবেচনা করে না, বা তার প্রকৃত রূপকে বিকৃত করে না; বরং মানুষকে সর্বগুণের ধারক হিসাবে চিত্রিত করে। এটা মানুষের ভালো দিক, মন্দ দিক- দু'টোই তুলে ধরার পাশাপাশি তার মধ্যে এক ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত রাখে এবং তার সহজাত গুণ (ফিতরাত)-এর প্রতি অটুট আস্থা রাখে। মানুষের আদি উৎস হ'ল কাদামাটি। কিন্তু সে আবার ইলাহী গুণেরও ধারক।

আল্লাহ বলেন, 'যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হ'তে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হ'তে। পরে তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহের অংশবিশেষ' *(সাজদাহ ৭-৯)*।

এভাবে মানুষ ইলাহী গুণের ধারক, যেটা তার মধ্যেকার অপার সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। এই অপার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম মুমিনের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে।

আল্লাহ বলেন, 'যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব' *(আনকাবূত ৬৯)*।

ইসলামী সাহিত্য অবশ্যই একজন মুমিনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, ঈমান-আক্বীদার মযবূতি তুলে ধরার পাশাপাশি অন্যায়-অপরাধ, যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তার অবিরাম জিহাদের চিত্রও তুলে ধরবে। ইসলামী সাহিত্য হতাশা-ব্যর্থতার সাহিত্য নয়, আশা-আকাঙ্ক্ষার সাহিত্য। এক্ষেত্রে ইসলামী সাহিত্য অস্তিত্ববাদী সাহিত্যের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইসলাম ভালো-মন্দ মিশ্রিত সামাজিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে। বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। কিন্তু সাথে সাথে ইসলামী সমাজের মূলনীতির আলোকে একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গঠনের মাধ্যমে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে চায়। একারণে ইসলামী সাহিত্য শ্রেণী-সংগ্রামকে বড় করে দেখায় না, যেমনটা মার্ক্সবাদী সাহিত্যে হয়ে থাকে, বরং সমাজ ও অর্থনীতির ভালো দিক তুলে ধরার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে চায়।

এটা 'বাস্তববাদী সাহিত্য', তবে তা মার্ক্সবাদী অর্থে নয়, বরং এটাকে 'ইসলামী বাস্তববাদী' (Islamic realism) সাহিত্য হিসাবে অভিহিত করা যায়। এটা বাস্তববাদের নামে মানুষের মন্দপ্রবণতা, সমাজের অন্যায়-অবিচার আর মানবজীবনের অন্ধকার দিককে বাড়িয়ে দেখায় না। যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহ 'দোষ-ত্রুটি গোপনকারী' (সাত্তারুল উয়ূব)। তাই একজন মুমিনও নষ্ট ও খারাপ দিক ঢেকে রেখে সত্য, সুন্দর আর পূর্ণতার সন্ধান করবে। ইসলামী সাহিত্য কোন

---

১৯. *মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis): মানসিক রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি বিশেষ, যাতে রোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তার শৈশব জীবনের ঘটনাবলির মধ্যে রোগের নিহিত কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয় এবং ঐসব ঘটনা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুলে রোগ নিরাময় করা হয়।-অনুবাদক*

২০. *চেঙ্গিস খান: (১১৬২- ১২২৭ খ্রি.) একজন মঙ্গল যোদ্ধা, শাসক ও ইতিহাসবিখ্যাত বিজেতাদের অন্যতম।-অনুবাদক*

২১. *অ্যাটিলা দ্য হান: (জন্ম. ৪০৬- মৃত্যু. ৪৫৩ খ্রি.) ৪৩৪ হতে ৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হান সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন।-অনুবাদক*

২২. *বশীর আহমেদ দার, আ স্টাডি অন ইকবাল'স ফিলোসোফি (লাহোর, ১৯৪৪), পৃ. ২৪।*

ভাববাদীর কল্পনাপ্রসূত সাহিত্য নয়, বরং এটি এমন এক সাহিত্য, যা সরাসরি মানবজীবন ও মানবিক কর্মকাণ্ডের মঞ্চ। এই পৃথিবী হ'তে রসদ গ্রহণ করে পুষ্ট হ'তে চায়। ইসলামী সাহিত্য এমন এক সাহিত্য, যা মানুষকে পার্থিব জীবনের জটিল গোলকধাঁধায় পথ চলতে সাহায্য করে। এমনিভাবে নিজের ও সমাজের মধ্যে জেঁকে বসা অন্যায়-দুর্নীতির মতো অপশক্তিকে রুখে দিয়ে অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে সাহায্য করে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের পথে যে যাত্রা, ইসলামী সাহিত্য সে যাত্রায় কাণ্ডারী হিসাবে কাজ করে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর হ'তে আরেক স্তরে আরোহণ করবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/১৯)*।

ইসলামী সাহিত্য কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাহিত্য নয়, এটি সামাজিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে এবং যে কোন সময়ের যে কোন ঘরানার সাহিত্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে। তবে এটা কোন অবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধকে ম্লান হ'তে দেবে না বা এর আসল উদ্দেশ্য হ'তে বিচ্যুত হবে না।

সাহিত্যের বাহ্যিকরূপ (Form) ও বিষয়বস্তুর (Content) প্রশ্ন বিশ্বের প্রায় সব গবেষককে চিন্তিত করে রেখেছে। এখানে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা অসঙ্গত হবে না। কারো কারো মতে, সাহিত্যের সৌন্দর্য হ'ল তার অবয়বে,একারণে সারবস্তু যাই-ই হোক, যতক্ষণ তা সবধরনের সাহিত্য-অলংকার সহযোগে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিবেশিত হবে, ততক্ষণ তা সফল সাহিত্য হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে ইসলামী সাহিত্য বাহ্যরূপ নয়, বরং বিষয়বস্তুকে সবসময় মুখ্য মনে করে। এমনকি মানুষের ক্ষেত্রেও বাহ্যিকরূপ (ছূরত) নয়, বরং হৃদয়ের শুদ্ধতাকে বিবেচ্য বলে গণ্য করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা নয়, বরং অন্তর ও কর্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন'।[২৩]

রাসূল (ছাঃ)-এর এই হাদীছকে সাহিত্যের রূপ ও বিষয়বস্তুর প্রশ্নে ইসলামী সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা যায়। উপরন্তু, যেসব কবির কবিতা কোন অর্থ বহন করে না, কেবল শব্দ নিয়ে খেলা করে, কুরআন তাদের সমালোচনা করেছে। 'এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই। তুমি কি দেখ না তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুড়ে বেড়ায়? এবং তারা তো বলে যা তারা নিজেরা করে না। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে' *(শু'আরা ২৬/২২৪-২৭)*।

উক্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় সাইয়েদ কুতুব বলেন, এখানে কবিদের তিরস্কার করার অর্থ এই নয় যে, ইসলাম কাব্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, বরং এখানে কেবল কবিদের লাগামহীন কল্পনা আর উদ্দাম আবেগের নিন্দা করা হয়েছে, কেননা তা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার জন্য ক্ষতিকর।[২৪] ইমরুল কায়েসের মু'আল্লাকাতসহ ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিতাসমূহ অর্থহীন কাব্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। অতএব ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল সাহিত্যকর্ম মূল্যায়নে বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ইসলামী সাহিত্য হ'ল তাওহীদী প্রেরণায় ঋদ্ধ। তাই এই সাহিত্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত তাওহীদী চেতনাকে সংহত করা। এই সাহিত্য একজন মুসলিমের মূল্যবোধ হ'তে উৎসারিত। ফলে ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন সাহিত্য ইসলামী সাহিত্য বলে বিবেচিত হ'তে পারে না। এই সাহিত্য একজন মুসলিমের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কামনা করে। এই সাহিত্য কেবল মূল্যায়নের জন্য নয়, বরং চিন্তা ও গবেষণার জন্য। এই সাহিত্য মানুষের স্থূল আবেগে নয়, বরং আত্মার উচ্চতর জগতে নাড়া দিবে। এটি প্রত্যেক যুগের প্রচলিত সাহিত্য ঘরানার মাধ্যমে সমসাময়িক সমস্যা তুলে ধরবে। এই সাহিত্যের ক্ষেত্র মহাবিশ্বের সমান বড়। এই সাহিত্য কেবল ইহকালের জন্য নয়, পরকালের জন্যও। এককথায় আল্লাহ্‌র দেয়া আদর্শ সম্বলিত এই সাহিত্য সর্বযুগের সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।

২৩. *ছহীহ মুসলিম হা/২৫৬৪।*

২৪. *সাইয়েদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন-এ অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)

-ড. নূরুল ইসলাম*

(৮ম কিস্তি)

আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী উপমহাদেশে ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত মুখলিছ দাঈ এবং আহলেহাদীছ জামা'আতের রাহবার ও নিশানবরদার ছিলেন। আহলেহাদীছ জামা'আতের মাঝে সাংগঠনিক চেতনা জাগ্রতকরণ ও তাদের উন্নতি-অগ্রগতি বিধানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৬ সালের ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর (৬ ও ৭ই যুলকা'দা ১৩২৪ হিঃ) ভারতের বিহার প্রদেশের আরাহ যেলায় (বর্তমানে ভোজপুর যেলার কেন্দ্রীয় শহর) অবস্থিত ও খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম ইবরাহীম আরাভী প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা আহমাদিয়াহ'-এর ইলমী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারতবর্ষের বহু শীর্ষস্থানীয় আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ছিলেন অন্যতম। আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) শুধু সেমিনারে অংশগ্রহণকারীই ছিলেন না; বরং সংগঠন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অগ্রচিন্তক ও উৎসাহ-অনুপ্রেরণাদাতা ছিলেন'।[১] উক্ত ইলমী সেমিনারে আহলেহাদীছ জামা'আতের অবস্থা আলোচনা করা হয়। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আহলেহাদীছদেরকে সুসংগঠিত করা এবং জনগণের দোরগোড়ায় কুরআন ও সুন্নাহ্র দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সেমিনারে উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম ও সুধীমণ্ডলীর সর্বসম্মতিক্রমে 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' নামে সর্বভারতীয় আহলেহাদীছ সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২] 'উসতাযুল আসাতিযাহ' (শিক্ষককুলের শিক্ষক) মাওলানা হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী এর প্রথম সভাপতি (ছদর), মাওলানা হাফেয আব্দুল আযীয রহীমাবাদী সহ-সভাপতি (নায়েবে ছদর), মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সাধারণ সম্পাদক (নাযেমে আ'লা), মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী সহ-সম্পাদক ও আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী কোষাধ্যক্ষ (আমীন) নির্বাচিত হন। মাওলানা অমৃতসরী আমৃত্যু কনফারেন্স-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।[৩] সেমিনারে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে মাওলানা হাফেয আব্দুল আযীয রহীমাবাদীকে প্রধান করে মাওলানা অমৃতসরী ও মাওলানা শিয়ালকোটীর সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি দাওয়াতী টিম গঠন করা হয়। এই তিন দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন ও দাঈ আড়াই মাস[৪] দেশব্যাপী দাওয়াতী সফর করে আহলেহাদীছদের সামনে কনফারেন্স গঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন, তাদেরকে জামা'আতী যিন্দেগী গঠনের দাওয়াত দেন এবং আঞ্জুমান গঠনের প্রতি উৎসাহিত করেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সারাদেশে কনফারেন্সের বহু শাখা গঠিত হয়। ঝিমিয়ে পড়া আহলেহাদীছ সমাজ সঞ্জীবনী শক্তি ফিরে পায়। বড় বড় আহলেহাদীছ আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কনফারেন্স-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা পূর্বক দাওয়াতী কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।[৫]

মজার ব্যাপার হ'ল, উক্ত টিম রাজশাহী থেকে তাদের দাওয়াতী সফর শুরু করেছিলেন। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে দীর্ঘ কষ্টকর সফর শেষে তারা এখানে এসে পৌঁছেছিলেন। মাওলানা অমৃতসরী উপস্থিত জনতার সামনে উর্দূতে সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বক্তৃতা করছিলেন। কিন্তু গ্রাম-গঞ্জ থেকে আগত বাঙ্গালীরা মাওলানার বক্তব্য বুঝতে পারছিলেন না। এজন্য একজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে বলেই ফেলে, আমরা মাওলানার কথা বুঝতে পারছি না। এ সময় একজন বাঙ্গালী, যিনি উর্দূ বুঝতেন, তিনি অমৃতসরীর বক্তব্য বাংলায় অনুবাদ করে দেন। এতে উপস্থিত জনতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী প্রতিনিধি দলকে সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং সংগঠনের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।[৬]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এই সফরের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'আমরা রাজশাহীতে (বাংলাদেশ) কয়েকদিন অবস্থান করার পর কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করি এবং পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই জুম'আর দিন খুৎবার সময় সেখানে গিয়ে পৌঁছি। তবে তারা 'আহলেহাদীছ' পত্রিকা মারফৎ জানতে পেরেছিল যে, কনফারেন্সের প্রতিনিধি দল বঙ্গদেশে সফর করবে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাদের নিকট গিয়ে পৌঁছবে। জুম'আর ছালাত শেষে আমি দাঁড়িয়ে প্রতিনিধি দল পৌঁছার এবং এর দলনেতা যে আল্লামা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী তা ঘোষণা করলাম। ফলে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী মসজিদে বসে

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, পৃঃ ৪৫।

২. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী, বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী সার গোযাশত (লাহোর : আল-মাকতাবা আস-সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১২), পৃঃ ১৪; প্রফেসর ড. আব্দুল গফূর রাশেদ, আহলেহাদীছ মনযিল বহ্ মনযিল (লাহোর : মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান, ১ম প্রকাশ, মে ২০০১), পৃঃ ৬৯-৭১, ৮৪; দাবিস্তানে নাযীরিয়াহ ১/৪৪০, ৪৬২-৪৬৩; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮।

৩. দাবিস্তানে নাযীরিয়াহ ২/১২৫; মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু (বেনারস : জামে'আ সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৭৯), পৃঃ ৩১৪, ৩১৬।

৪. মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুহু আল-ফাল্লাহ, তাহরীকে আহলেহাদীছ কে চান্দে আওরাক (ফয়ছালাবাদ : জামে'আ সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১), পৃঃ ৯৮।

৫. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩০৬-৩১০; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৫; বাযমে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৬০-১৬১।

৬. আব্দুল মুবীন নাদভী, আশ-শায়খ আল-আল্লামা আবুল অফা ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী জুহূদুহু আদ-দা'বিয়াহ ওয়া আছারুহু আল-ইলমিইয়াহ, পৃঃ ১৩৯-১৪০। গৃহীত : দাঊদ রায, হায়াতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৬২-৮৬।

অপেক্ষা করতে লাগল। ছালাতের পর তারা প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। এরপর কলকাতায় কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। কলকাতার মুসলমানরা উর্দু বলতে পারে এবং সহজেই তা বুঝতে পারে। এজন্য রাজশাহীতে প্রতিনিধি দলটি যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা এখানে হয়নি। আমরা কয়েকদিন কলকাতায় অবস্থান করলাম। তাদের সামনে আমাদের সফরের উদ্দেশ্য এবং আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনা করলাম। ফলে মানুষজন আমাদের উদ্দেশ্যগুলির সাথে শুধু একাত্মতা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হ'ল না, বরং নগদ অর্থকড়ি দিয়েও সাহায্য করল'।[৭]

গবেষক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর পিএইচ.ডি থিসিসে বলেন, 'মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) ১৯১৩ সালে একবার বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন। তিনি পশ্চিম বাংলার দুমকা ও মুর্শিদাবাদ যেলার কয়েকটি গ্রাম যেমন দিলালপুর, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর ও বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলাধীন নারায়ণপুর প্রভৃতি গ্রাম সফর করেন। পাঞ্জাবে ফিরে গিয়ে তিনি স্বীয় 'আখবারে আহলেহাদীছ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। সেখানে একস্থানে তিনি বলেন, ... 'আমি এই সফরে কেবলি চিন্তা করেছি বাংলাদেশে আহলেহাদীছের সংখ্যা এত বেশী কিভাবে হ'ল ও কার দ্বারা হ'ল? আমাকে বলা হ'ল যে, এসব মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর বরকতেই হয়েছে'।[৮]

অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর উদ্যোগে প্রত্যেক বছর সাধারণত তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক কনফারেন্স বা জালসা অনুষ্ঠিত হত। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন শহরে এর মোট ২৪টি বার্ষিক জালসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাওলানা অমৃতসরী এসব জালসার প্রাণস্পন্দন ছিলেন। তিনি ছাপড়া (১৯৩৩), আরাহ (১৯৪০) ও দিল্লী (১৯৪৪) কনফারেন্সে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন।[৯]

আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'এই কনফারেন্সের বদৌলতে সমগ্র দেশের আহলেহাদীছ জামা'আত এক কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তন করছিল এবং মাওলানা অমৃতসরীর ব্যক্তিগত সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' এর মুখপত্রের ভূমিকা পালন করছিল'।[১০]

অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রভাব শুধু ভারতের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও কনফারেন্স-এর সদস্যদের ইলখাছ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তা বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তুরস্ক, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, মিসর, সঊদী আরব সহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্র এই সংগঠনের কর্মতৎপরতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং এর অবদানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী দেশের ভেতরে ও বাইরে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহে এই সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। ১৯২৬ সালে তিনি বাদশাহ আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর আহ্বানে হেজাযে অনুষ্ঠিত হারামাইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। সম্মেলনে তিনি আরবীতে দু'একটি বক্তৃতাও প্রদান করেছিলেন।[১১]

এভাবে মাওলানা অমৃতসরী অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-কে 'কুল হিন্দ' (সমগ্র ভারত) থেকে 'কুল দুনিয়া' (সমগ্র বিশ্বে) পরিচিত করার যে স্বপ্ন লালন করেছিলেন তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল।

অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর বার্ষিক জালসা সমূহ ছাড়া প্রাদেশিক, যেলা, এলাকা ও স্থানীয় জালসাগুলিতেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন এবং জনসম্মুখে তেজোদীপ্ত ভাষায় আহলেহাদীছের আক্বীদা ও আমল তুলে ধরতেন।[১২]

অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স গঠনের পর পাঞ্জাবে স্থানীয় আহলেহাদীছ আঞ্জুমান সমূহ গঠিত হতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে এসব আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর প্রচেষ্টা ও অবদান ছিল অতুলনীয়। আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'পাঞ্জাবেই সবচেয়ে বেশী আহলেহাদীছ আঞ্জুমান সমূহ গঠিত হয়েছিল এবং এগুলিই সবচেয়ে বেশী তৎপর ছিল। নিকটে হওয়ার কারণে বারবার হাযির হওয়া ও সামনা সামনি কথা বলার সুযোগও তিনি বেশী পেতেন। সম্ভবতঃ এটিও একটি কার্যকরী উপাদান ছিল। অবশ্য দেশের অন্যান্য স্থানের আঞ্জুমানগুলোও কম সক্রিয় ছিল না'।[১৩] অমৃতসরীর প্রচেষ্টায় পুরা পাঞ্জাবে যখন বহু আঞ্জুমান গঠিত হ'ল তখন তিনি চিন্তা করলেন, পাঞ্জাবে একটি প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা দরকার যার সাথে বিভিন্ন শহর, এলাকা ও গ্রামীণ জনপদের ছোট-বড় সকল আঞ্জুমান সংযুক্ত থাকবে। এর সদর দফতর হবে লাহোরে। অতঃপর ১৯২০ সালে 'ছদর আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ ছূবা পাঞ্জাব' নামে সেই কাঙ্ক্ষিত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এর প্রথম সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে মাওলানা আব্দুল কাদের কাছূরী (মৃঃ ১৯৪২) ও মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। ৮ বছর তাদের গতিশীল নেতৃত্বে আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব-এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। অতঃপর ১৯২৮ সালে 'রহমাতুল্লিল

৭. নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০। গৃহীত : হায়াতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৬৩।
৮. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৭১; সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ১০ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ২৫শে এপ্রিল ১৯১৩।
৯. বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী সার গোযাশত, পৃঃ ১৫-১৭।
১০. ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৬।
১১. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩১১; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩; ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৭২।
১২. ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৬।
১৩. ঐ।

আলামীন' গ্রন্থের লেখক মাওলানা কাযী সুলাইমান মানছূরপুরী ও 'সীরাতে ছানাঈ'-এর লেখক মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী (মৃঃ ১৯৫৯) যথাক্রমে এর নতুন সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।[১৪]

'মুআররেখে আহলেহাদীছ' খ্যাত মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী বলেন, 'পাঞ্জাবের সকল আহলেহাদীছ আঞ্জুমানের সম্পর্ক ছিল আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব-এর সাথে এবং পাঞ্জাবের আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর সাথে সংযুক্ত ছিল। এটি ছিল একটি সিলসিলা, যা নিচ থেকে উপর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। এটি পুরা হিন্দুস্তানের আহলেহাদীছ জামা'আতের মযবূতির প্রমাণ। আহলেহাদীছ জামা'আতের এই সিলসিলা দেশ বিভাগ পর্যন্ত কায়েম ছিল। দেশের সকল মাযহাবী জামা'আত ও মাসলাকী পরিমণ্ডলে এই সিলসিলাকে সম্মানের চোখে দেখা হত এবং খায়বার পাখতুনখোয়া থেকে রাস কামারী পর্যন্ত এর ধ্বনি গুঞ্জরিত হত। ছোট-বড় বিভিন্ন স্থানে এর তাবলীগী জালসা সমূহ অনুষ্ঠিত হত, যাতে ওলামায়ে কেরাম বক্তব্য প্রদান করতেন এবং দূর-দূরান্ত থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ এসে তাদের বক্তব্য শুনত ও প্রভাবিত হত'।[১৫]

১৯২১ সালের ২০শে অক্টোবর (১৭ই রবীউল আউয়াল ১৩৪০ হিঃ) ইসলামিয়া কলেজ, লাহোর সংলগ্ন মসজিদে মুবারকে আহলেহাদীছ জামা'আতের এক প্রতিনিধি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে আহলেহাদীছ জামা'আতের 'আমীর' নির্বাচিত করা হয়। তিনি 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমৃত্যু আহলেহাদীছ জামা'আতের 'আমীর' হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৬]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী আহলেহাদীছ জামা'আতকে আর্থিক সহযোগিতাও করতেন। যখনই জামা'আতের অর্থের প্রয়োজন পড়ত তখনই তিনি উদারহস্তে খরচ করতেন। বহু জালসা ও সাংগঠনিক প্রোগ্রামের প্রচারপত্র, পোষ্টার প্রভৃতি নিজ খরচে ছাপাতেন। ১৯৩০ সালে তিনি শত শত টাকা খরচ করে আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর পনের হাযার প্রচারপত্র নিজ খরচে ছাপেন। এভাবে ১৯৩৫ সালে মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করে তিনি কয়েক হাযার প্রচারপত্র ছাপিয়ে জামা'আতের পক্ষ থেকে ফ্রি বিতরণ করেন। অনেক সময় আহলেহাদীছ কনফারেন্স বা জালসায় আগত অতিথিদের আপ্যায়নের দায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হত। একবার অমৃতসরে আহলেহাদীছ জামা'আতের চারশ ব্যক্তির এক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তাদের থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যয় তিনি নির্বাহ করেন এবং তিনদিন পর্যন্ত তাদের আতিথেয়তা প্রদান করেন।

একবার তিনজন আহলেহাদীছ ছাত্র উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। কিন্তু দরিদ্রতা তাদের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মাওলানা অমৃতসরী তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পড়াশোনার যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেন।[১৭]

নাদওয়াতুল ওলামা, লাক্ষ্ণৌ প্রতিষ্ঠায় অবদান :

দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা, লাক্ষ্ণৌর সাথে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। তিনি নাদওয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও স্থায়ী সদস্য ছিলেন। ১৮৯২ সালে (১৩১০ হিঃ) কানপুরের ফয়যে আম মাদ্রাসার ফারেগ ছাত্রদের (৮ জন) মাঝে সনদ বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত দস্তারবন্দী অনুষ্ঠানে নাদওয়াতুল ওলামা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মাওলানা মুহাম্মাদ লুতফুল্লাহ আলিগড়ীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই অধিবেশনে উক্ত মাদ্রাসা থেকে সদ্য ফারেগ মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীও অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সবচেয়ে কমবয়সী ছিলেন।[১৮] নাদওয়াতুল ওলামার সাবেক রেক্টর মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন, وكان له فضل في تأييد ندوة العلماء التي ظل عضواً فيها طول حياته. 'নাদওয়াতুল ওলামা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সমর্থন দানে অমৃতসরীর অবদান ছিল অতুলনীয়। তিনি আজীবন এর সদস্য ছিলেন'।[১৯]

মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী নাদওয়াতুল ওলামা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অমৃতসরীর অবদান সম্পর্কে বলেন, 'মরহুম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী শুরু থেকেই নাদওয়াতুল ওলামার সদস্য ছিলেন। এমনকি মাওলানার নিজের ভাষ্য অনুযায়ী কানপুরের ফয়যে আম মাদ্রাসায় তাঁর দস্তারবন্দী অনুষ্ঠানেই নাদওয়াতুল ওলামার জন্ম হয়'।[২০]

ভারতের বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করার সময় তিনি বছরে দু'একবার লাক্ষ্ণৌতে আসতেন এবং দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামায় গিয়ে বন্ধু-বান্ধব ও তথাকার শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।[২১]

নাদওয়াতুল ওলামার ছাত্র ও পরিচালনা কমিটির মাঝে বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট মতদ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে 'মজলিসে ইছলাহে নাদওয়া' (নাদওয়া সংস্কার কমিটি) গঠিত হয়। মাওলানা নিযামুদ্দীন হাসান (ভূপাল ও হায়দ্রাবাদের সাবেক আমলা) কমিটির সভাপতি এবং নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)-এর পুত্র শামসুল ওলামা নওয়াব সাইয়িদ আলী হাসান খান (মৃঃ ১৯৩৬) এই কমিটির

---

১৪. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩০২-০৪; বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী সার গোযাশত, পৃঃ ২০।

১৫. বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কি সার গোযাশত, পৃঃ ২০।

১৬. ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৬; মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী হায়াত খিদমাত আছার, পৃঃ ৭৫-৭৬।

১৭. সীরাতে ছানাঈ পৃঃ ৩১৬-৩১৭; আশ-শায়খ ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী ওয়া জুহূদুহু আদ-দা'বিয়াহ (মাস্টার্স থিসিস), পৃঃ ৩৭৪।

১৮. হায়াতে শিবলী, পৃঃ ২৫০-২৫১; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ২২, ৪৭; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩-১১৪।

১৯. নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫।

২০. মাসিক মা'আরিফ, মে ১৯৪৮, পৃঃ ৩৮৮; ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৭০; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।

২১. ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৬৯।

সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এর সদস্য ছিলেন।[২২] এতুদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালের ১০ই মে সকাল ৮-টায় হাকীম আজমল খাঁর দাওয়াতে দিল্লীতে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমগ্র ভারতের খ্যাতিমান ওলামায়ে কেরাম ও প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এতে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠক চলাকালে নাদওয়ার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কল্পনাতীত হৈচৈ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার সাথে বৈঠক পরিচালনা করে তাদেরকে নিবৃত্ত করেন।[২৩] পরবর্তীতে এক সাক্ষাতে হাকীম আজমল খাঁ অমৃতসরীর এই ভূমিকার প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আপনি সুশৃঙ্খলভাবে বৈঠক পরিচালনা করতে পারবেন। কিন্তু আপনি যতটা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ঠিক ততটা আমি আশা করিনি' *(আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ২২শে মে ১৯১৩, ২৯শে মে ১৯১৪, ৫ই জুন ১৯১৪)*। এথেকে বুঝা যায়, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের কারণে সর্বমহলে সমাদৃত ছিলেন।

যাহোক, বৈঠকে আলোচনা-পর্যালোচনার পর নাদওয়ার গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। মাওলানা অমৃতসরী এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য দিল্লীর সাবেক জজ পীরযাদা মুহাম্মাদ হুসাইনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিন দিনের মধ্যে তিনি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে কমিটির নিকট পেশ করেন।[২৪]

জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও অমৃতসরী :

১ম বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯১৪-১৯১৮) মিন্টু মরলে (Minto Morley) ভারতীয়দের জন্য একটি স্কীম নিয়ে ভারতে আসেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে এটি 'মিন্টু মরলে স্কীম' নামে পরিচিত। এ প্রেক্ষিতে মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গীমহলী ও মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর উৎসাহে লাক্ষ্ণৌতে ১৯১৭ সালে ওলামায়ে কেরামের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারতীয় মুসলমানদের কিছু ধর্মীয় বিষয় বিবেচনার জন্য আলেমগণের একটি প্রতিনিধি দল মিন্টু মরলের সাথে দেখা করবে মর্মে প্রস্তাব পেশ করা হয়। লাক্ষ্ণৌর সেই সম্মেলনে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে ইসলামের আলোকে জনসাধারণকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আলেমগণের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে দু'দিন ধরে আলোচনা চলে। কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়াই সম্মেলন সমাপ্ত হয়। তথাপি মাওলানা অমৃতসরী নিরাশ না হয়ে বিভিন্ন জালসা ও সম্মেলনে এবং সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় এ ধরনের অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। অতঃপর ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তাঁর প্রচেষ্টায় দিল্লীতে একটি তাবলীগী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। এই সুযোগে তিনি জমঈয়ত গঠনের বিষয়ে লাক্ষ্ণৌ সম্মেলনে পেশকৃত প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করেন। অনেক আলেম তাঁর এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে অমৃতসরে খেলাফত মজলিস ও মুসলিম লীগের সম্মেলন ছিল। এতে খেলাফত ও তুরস্কের বিষয়ে আলোচনার জন্য দেশের অনেক প্রথিতযশা আলেম অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। এই উপলক্ষ্যে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও মাওলানা দাঊদ গযনভী আলেমগণকে অমৃতসরে আসার দাওয়াত দেন। যাতে এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ গঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। দিল্লী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর অমৃতসরে ভারতবর্ষের আলেমগণের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন শুরু হয়। এতে দেশবরেণ্য ৫২ জন আলেম অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ' নামে সর্বভারতীয় আলেমগণের সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সম্মেলনে মাওলানা অমৃতসরী মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ কেফায়াতুল্লাহ দেহলভীকে সভাপতি এবং মাওলানা আহমাদ সাঈদ দেহলভীকে সেক্রেটারী করার প্রস্তাব দিলে মাওলানা সালামাতুল্লাহ জয়রাজপুরী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ তাতে সমর্থন দেন। এই সম্মেলনে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে আমেলা গঠিত হয়। হাকীম মুহাম্মাদ আজমল খাঁ সংগঠনের খসড়া নীতিমালা তৈরীর জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। ফলে সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ, মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী ও মাওলানা খায়রুয্যামানের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নীতিমালা তৈরী করে ১লা জানুয়ারী ১৯২০ইং তারিখে পেশ করলে তা গৃহীত হয়। এ অধিবেশনে মাল্টা দ্বীপে বন্দী মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীর মুক্তির বিষয়ে প্রথম রেজুলেশন পাশ হয়েছিল। মাওলানার মুক্তির দাবীতে ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। এর খরচ বহন করেছিলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী।[২৫]

---

২২. *হায়াতে শিবলী, পৃঃ ৫০৪; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬-১১৭।*
২৩. *ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৭১; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৭।*
২৪. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৭; চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ১৯০; হায়াতে শিবলী, পৃঃ ৫০৫-৫০৮; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৮।*
২৫. *হাকীম মাহমূদ আহমাদ, ওলামায়ে দেওবন্দ কা মাযী (লাহোর : ইদারা নাশরুত তাওহীদ ওয়াস সুন্নাহ, ২০০৩), পৃঃ ২৯-৩০; সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৭-৪৮; আহলেহাদীছ মনযিল বহ্ মনযিল, পৃঃ ৮৫-৮৬; মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব খালজী, 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ কী তাসীস মেঁ ওলামায়ে আহলেহাদীছ কা বুনিয়াদী কিরদার', মাসিক মুহাদ্দিছ, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ২৬/৬ সংখ্যা, জুন ২০০৮, পৃঃ ২১-২৫।*

www.at-tahreek.com

১৯২৫ সালে মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নাদভীর সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জমঈয়তের অধিবেশনেও মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২৬]

মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ গঠনে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করতে গিয়ে বলেন, وكان له فضل في تأسيس جمعية العلماء وتقويتها، 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ গঠনে ও তাকে শক্তিশালীকরণে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর অবদান ছিল অতুলনীয়'।[২৭] অমৃতসরী নিজেই বলেছেন, 'আমি শুরু থেকেই জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দের সদস্য আছি। এমনকি যদি বলা হয় যে, আমি এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রথম উৎসাহদাতা ছিলাম তাহলে অত্যুক্তি হবে না'।[২৮] মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমীর সাবেক সেক্রেটারী মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদভীকে ১৯৭১ সালের ৬ই জানুয়ারী লিখিত এক পত্রে এবং মুঈনুদ্দীন নাদভী 'হায়াতে সুলাইমান' গ্রন্থে অমৃতসরীকে জমঈয়তের ওলামায়ে হিন্দ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[২৯]

পরবর্তীতে জমঈয়ত তার প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্রমান্বয়ে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং কংগ্রেসের রঙে রঞ্জিত হয়। মাওলানা অমৃতসরী যখন দেখলেন যে, জমঈয়ত ও কংগ্রেসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই তখন তিনি এই সংগঠন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন।[৩০] এমনকি জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ দেহলভীও শেষ জীবনে জমঈয়ত ত্যাগ করেছিলেন।[৩১]

তাছাড়া তিনি মুহাম্মাদিয়াহ কোম্পানী (১৯০৯), আঞ্জুমানে ছাদেকীন (১৯১০), জমঈয়তে ইত্তেহাদুল ওলামা বা জমঈয়তে ইত্তেহাদুল মুসলেমীন প্রভৃতি সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন।[৩২]

২৬. *ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৭১; চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ১৯২।*
২৭. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫।*
২৮. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৪৯। গৃহীত : সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪২, পঃ ১১।*
২৯. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।*
৩০. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০; আশ-শায়খ ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী ওয়া জুহূদুহু আদ-দা'বিয়াহ, পৃঃ ৩৫২।*
৩১. *ঐ, পৃঃ ৩৫২।*
৩২. *ঐ, পৃঃ ৩৫২-৩৫৩।*

তাবলীগী ইজতেমা ময়দান ও দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ক্রয় প্রকল্পে দান করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোনেরা!

কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই সমাজে দ্বীনে হকের প্রচার ও প্রসারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বার্ষিক 'তাবলীগী ইজতেমা'র গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতি বছর ইজতেমায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহের উপর দলীল ভিত্তিক আলোচনা শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ফলে হাযার হাযার মানুষ প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে ফিরে আসছেন। ১৯৮০ সালে সংগঠনের উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজিত প্রথম জাতীয় সম্মেলনের পর ১৯৯১ সাল থেকে বিগত ৩০ বছর যাবত এই ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইজতেমার পরিসরও প্রতিনিয়ত ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। ফলে বর্তমানে একটির স্থলে পাঁচটি প্যান্ডেল করেও স্থান সংকুলান হচ্ছে না। এমতাবস্থায় ২০২১ সালের তাবলীগী ইজতেমার শেষ দিনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব আগামীতে নিজস্ব ময়দানে তাবলীগী ইজতেমা করার জন্য ৫০ থেকে ১০০ একর জমি ক্রয়ের ঘোষণা দেন এবং সাথে সাথে বহু আগ্রহী ভাই নগদ অর্থ ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত ইজতেমা ময়দানে বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসাবে ১৯৯৪ সাল থেকে আমীরে জামা'আতের স্বপ্নের দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ থাকবে ইনশাআল্লাহ। যা বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, প্রতি কাঠা জমির মূল্য সম্ভাব্য ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং ইজতেমা ময়দানে প্রতিজনের বসার স্থানের সম্ভাব্য মূল্য ২৫০০/- (আড়াই হাযার) টাকা।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে অন্তত এক কাঠা জমির মূল্য অথবা সামর্থ্য বিবেচনায় কমপক্ষে একজন বসার স্থানের সমপরিমাণ মূল্য দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। তবে যিনি যত বেশী দান করবেন তার নেকীর পাল্লা তত ভারী হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত মহতী কাজে শরীক থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব
তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড
একাউন্ট নং ০০৭১২২০০০০৭১৭
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং ০১৭৯৭৯০০১২৩;
রকেট নং ০১৭৯৭৯০০১২৩০

সেক্রেটারী জেনারেল
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সার্বিক যোগাযোগ : দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭৯৭-৯০০১২৩।

www.at-tahreek.com

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০২১ ২৪তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

সাক্ষাৎকার

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া

*[বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও জ্ঞানতাপস **প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া** (৬২), যিনি দেশে ও বিদেশে মোট ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২ বছর শিক্ষকতার অনবদ্য অভিজ্ঞতায় ভাস্বর। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে তাঁর রয়েছে গভীর মনীষা ও বিস্তর গবেষণা। সম্প্রতি আত-তাহরীক টিভির পক্ষ থেকে তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের পরিচালক **ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় এর ঈষৎ পরিবর্তিত অনুলিখিত রূপটি আত-তাহরীক পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হ'ল।- সম্পাদক]*

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *স্যার, আপনার জন্ম ও শিক্ষা জীবন সম্পর্কে জানতে চাই।*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : ১৯৫৯ সালে ময়মনসিংহ যেলা শহরে আমার জন্ম। আমরা তিন ভাই ও দুই বোন। এক ভাই ছোট বেলায় মারা গেছে। আমার বড় ভাই আমেরিকার আরিজোনা স্টেটের ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্ট এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-য়ে অফিসার হিসাবে কর্মরত আছেন। তারপর আমি আর আমার পরে আরো দুই বোন আছে। তাঁরা বিবাহিতা। আর আমার পিতা ও মাতা উভয়েই মারা গেছেন। আমার পিতা রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। আর মা ছিলেন একজন শিক্ষিকা। আমার তিন মেয়ে। তারা সকলেই পড়াশোনার মধ্যে আছে। আমার বড় মেয়ে আমেরিকায় পিএইচ.ডি করছে।

আর শিক্ষাজীবনের কথা বলতে গেলে প্রথম জীবনে আমি জীবনের লক্ষ্য নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। জানতাম না যে, আমার জীবনের মূল লক্ষ্য কী হওয়া উচিৎ। তাই ছাত্রজীবনও আমার বিক্ষিপ্ত অবস্থায় শুরু হয়েছিল। প্রথমে মিশনারী মরিয়াম স্কুল ও ময়মনসিংহ যেলা স্কুলে কিছুদিন পড়ি। সেখান থেকে ঢাকা মুহাম্মাদপুর রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল থেকে হাইস্কুল জীবন শেষ করি। তারপর ঢাকা কলেজ অতঃপর ময়মনসিংহ কলেজ। এরপর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজেও একবছর পড়েছি। তারপর আবার ছয় মাসের মত মেরিনে ছিলাম। পরিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইবিএ এবং এমবিএ শেষ করি। পরবর্তীতে আমেরিকায় বিজনেস রিলেটেড আরো উচ্চতর পড়াশোনা করার পর সর্বশেষ পিএইচ.ডি করেছি। এর মধ্যে ইসলামের প্রতি বিশেষ আগ্রহ তৈরী হ'লে ভার্জিয়ানার আমেরিকান ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করি।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *পেশাজীবন কখন শুরু করেন?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : ১৯৮৭-এর জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আমেরিকায় এক্সপ্রেস ব্যাংকে দুই বছর চাকুরি করলাম। তারপরে দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএতে লেকচারার পদে প্রায় বছরখানেক অধ্যাপনা করি। নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতেও কিছুদিন ছিলাম। পরে আবার আমেরিকা গেলাম। তারপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ একাধারে নিজ দেশসহ ৭টি দেশের মোট ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুযোগ হয়েছে আমার। এর মধ্যে রয়েছে আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়েস, টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি (১ বছর), লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি (১০ বছর), নর্দার্ন স্টেট ইউনিভার্সিটি, ডাকোটা (৩ বছর), ইউনিভার্সিটি অব স্ক্রানটন (১ বছর), সঊদী আরবের রিয়াদের কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এ্যাণ্ড মিনারেলস্ (৪ বছর), কাতারের কাতার বিশ্ববিদ্যালয় (৩ বছর), ওমানের সুলতান ক্বাবূস ইউনিভার্সিটি (৩ বছর), কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটি (১ বছর)। এছাড়া বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছি।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *শিক্ষকতার জন্য এত দেশে পদচারণা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমার চাকুরী জীবন শুরু হয়েছিল আমেরিকায়। বিদেশে চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় ভালো করে লক্ষ্য করতে হয়। একটি হ'ল একাডেমিক রিসার্চ তথা নিজের বিষয় বা ডিপার্টমেন্টাল বিষয়ে গবেষণার মানসিকতা এবং টিচিং পারফরমেন্স বা শিক্ষকতার দক্ষতা। এ দু'টি বিষয় ঠিক থাকলে বিদেশের মাটিতে চাকুরী পেতে বেগ পেতে হয় না।

আর এত জায়গায় চাকুরীর কারণ হ'ল, বিদেশে চাকুরী বাজারের দৃশ্যপট আমাদের দেশের মত নয়। আমাদের দেশের মানুষেরা একটা চাকুরী দিয়েই জীবন পার করে দেয়। কিন্তু বাইরে যে কোন সময় চাকুরীর ক্ষেত্র পরিবর্তন হ'তে পারে। যেমন আমি আমেরিকায় এক ইউনিভার্সিটিতে সেমিনার দিলাম। সেখানে ইংল্যাণ্ডের এক ইউনিভার্সিটির ডীন বসা ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমাদের ওখানে চলে আসো আর একটি সেমিনার দাও! পরে আমি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেমিনার দিলাম। জব অফারও হল। কিন্তু পরবর্তীতে আমার যাওয়া হয়নি। এগুলো বিদেশে খুব স্বাভাবিক বিষয়।

এছাড়াও আমার বিদেশে অনেক ইউনিভার্সিটিতে চাকুরীর অফার এসেছিল। যেমন জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, লেবানন, সাউথ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে। তবে শেষ পর্যন্ত এগুলোতে যাওয়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *এ পর্যন্ত আপনার কতটি গবেষণাপত্র বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : একশ'র মত হবে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আপনি তো বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে দেখেন? এখানকার*

www.at-tahreek.com

শিক্ষাব্যবস্থা কতটুকু মানসম্পন্ন?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : এ বিষয়ে আমি একটু অন্যভাবে বলব। প্রথমতঃ উচ্চতর জ্ঞানার্জন দুইভাবে হয়ে থাকে। (১) ডিসিমিনেশন অফ নলেজ বা জ্ঞানের প্রচার-প্রসার, যা গবেষণা এবং প্রায়োগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর এর অন্যতম প্রক্রিয়া হ'ল টিচিং বা শিক্ষাদান। এর রূপরেখা হ'ল একজন শিক্ষকের নিজ বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনার মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞানার্জন করা এবং পাশাপাশি ইউনিভার্সিটির অন্যান্য সকল বিষয়ে একটা দখল থাকা। জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের এই প্রক্রিয়াটিকে দেখভাল করতে হয় ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং বিকাশ ঘটানো; সাথে সাথে উচ্চশিক্ষার নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে মান নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং তদনুযায়ী সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা। (২) ক্রিয়েটিং নিউ নলেজ বা নিত্য-নতুন জ্ঞানের পরিধিকে বাড়ানো এবং ডাইনামিক বা যুগের চাহিদানুযায়ী জ্ঞানকে শাণিত করা। এর রূপরেখা হ'ল প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষকের ক্লাস কম থাকবে এবং ক্লাস বিষয়ক গবেষণার জায়গা থাকবে বিস্তৃত। যাতে করে শিক্ষক যথাযথ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে পরিশীলিত শিক্ষিত ছাত্রসমাজ গড়তে পারে। যারা জাতির ভবিষ্যৎ কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষার এ দু'টি দিকের সাথে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করলে দেখা যায়, প্রথম কাঠামোর সাথে আমাদের মিল থাকলেও ইউজিসির দুর্বলতা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দুয়ারে নিক্ষেপ করেছে। আর দ্বিতীয়টির দিকে নযর দিলে দেখা যায় আমাদের দেশে শিক্ষকতার মান রক্ষার চেয়ে শিক্ষকদের ঘাড়ে ক্লাসের বোঝা বেশী চাপানো হয়। ফলে তারা ক্লাস কাতর শিক্ষকে পরিণত হয়ে যায়।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আমি ইসলামাবাদে দেখেছি সেখানে এইচইসি নামে একটা সরকারী উচ্চতর কমিশন আছে, যারা কঠোরভাবে উচ্চ শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই কমিশন প্রতিনিয়ত শিক্ষার মানোন্নয়নে দৃশ্যমান ভূমিকা রাখছে। আপনি কি ইউজিসির এমন কোন ভূমিকার কথা বলছেন?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : হ্যাঁ, আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা কমিশনকে তেমন নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। আন্তর্জাতিক রেটিং-এ ভাল কোন অবস্থানে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নেই। এ ব্যাপারে ইউজিসির কোন তদারকি নেই। নতুন জ্ঞানের সৃষ্টিতে তাদের বিশেষ ভূমিকা নেই। আর বর্তমান পরিবেশে নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবনে কাজ করা শিক্ষকদের পক্ষে খুব সহজও নয়। যেমন আমি একটা উদাহরণ দেই। আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রতি সেমিস্টার হয় ১৪ সপ্তাহে। বছরে ৩টি সেমিস্টারে মোট ক্লাস হয় ৪২টি সপ্তাহ। লুইজিয়ানায় আমার ক্লাস ছিল মোট ৩০ সপ্তাহ। বাকি যে ২২টি সপ্তাহ বা বছরের প্রায় অর্ধেকটা সময় আমি গবেষণা তথা নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবনে কাটাতাম। আর আমাদের পাবলিকেশন্সের উপর আমাদের প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধি নির্ভর করত। এজন্য যথেষ্ট উৎসাহভাতা দেয়া হ'ত। আমার সারা বছরে মাত্র ৪টা কোর্স ছিল। আর আমাদের দেশের শিক্ষকদের প্রতি সেমিস্টারে ৪টা কোর্স বা বছরে প্রায় ১২টা কোর্স থাকে। ফলে আমাদের দেশের শিক্ষকরা টিচিং-য়েই আটকে থাকছে। তারা গবেষণায় তেমন সময় দিতে পারছে না। ফলে কোয়ালিটি পাবলিকেশন্স এখানে খুব একটা হয় না। এসব বিষয়ে উচ্চশিক্ষা কমিশন কতদূর ভাবে তা আমাদের জানা নেই।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্ব র‍্যাংকিং-য়ে এত পিছিয়ে থাকার কারণ কী?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : মূল কারণ হ'ল, নতুন জ্ঞান সৃষ্টির কাজ তথা একাডেমিক গবেষণা আমাদের দেশে অনেক কম।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *অর্থাৎ একাডেমিক রিসার্চ বাংলাদেশে সেভাবে হচ্ছে না?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমি বলব, তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়। আর যেগুলো হয়, সেগুলোও কোয়ালিটিতে অনেক পিছিয়ে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *বাংলাদেশের প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মত কি? বাইরের দেশের তুলনায় আমাদের ছেলে-মেয়েরা তুলনামূলক পিছিয়ে কেন?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : এক্ষেত্রে আমি বলব, এমনিতে স্বাভাবিক নিয়ম-কানূনের জায়গায় এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত দেশগুলোর মতই আছে। তবে এখানে শুধু সুন্দর পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। পরিকল্পনা দুই প্রকার- দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী। প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে তা হ'ল আমাদের পড়াশোনার দুর্বলতাগুলি খুঁজে বের করা এবং সে বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা ও গবেষণা করে সুন্দর পরিকল্পনা উপস্থাপন করা। তারপরে তা বাস্তবায়নে নেমে পড়া। কিন্তু আমাদের প্রতিটি স্তরে গলদগুলো রয়ে গেছে। ফলে ভাল কোন ফলাফল আমরা পাচ্ছিনা। ভাল কিছু পেতে প্রচুর পড়াশোনা ও গবেষণা দরকার, যে কাজটি উন্নত বিশ্বে হয়ে থাকে। প্ল্যান বেইজড এ্যাকশন তথা পরিকল্পনা মাফিক কাজের ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট দুর্বলতা আছে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আমাদের দেশে একটা ছাত্র একেবারে প্রাথমিক ক্লাস থেকে ইংরেজী শিক্ষা শুরু করে। কিন্তু অনার্স শেষ করেও সে ভালো ইংরেজি বুঝেনা। এর কারণ কী?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : শিক্ষাটা আসলে ছাত্র-শিক্ষকের ব্যাপার। ছাত্রের ব্যাপারে বলব, তাকে সর্বপ্রথম লাইফ গোল সেটিং বা জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। আর শিক্ষকদের বলব পড়াশোনার পদ্ধতিগত উন্নতি করতে হবে। বিভিন্ন দেশে এসব বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক বছর একজন শিক্ষক তার পড়াশোনার কী কী ধাঁচ পরিবর্তন করেছে, নতুন বছর নতুনদের জন্য সে কী মেথড এ্যাপ্লাই করবে ইত্যাদি বিষয়ে রীতিমত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়। ইচ্ছামত পড়ানোর সুযোগ নেই। নইলে চাকুরী পর্যন্ত চলে যেতে পারে। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষকরা যুগ যুগ ধরে একঘেঁয়েভাবে একই পদ্ধতিতে ছাত্রদের পড়িয়ে আসছেন। ছাত্রদেরকে পড়াশোনায় ইন্টারেস্টেড করানো হচ্ছে না। মোটিভেশন করা হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক উন্নয়নের জন্য কোন এ্যাডভাইজারী বোর্ড নেই, যারা প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। ফলে ছাত্রদের শিক্ষামান উন্নয়নে ভাল কোন কিছু জাতি পাচ্ছে না। ছাত্ররা অদক্ষ হয়ে গড়ে উঠছে। আর একারণেই বহুদিন ধরে কোন বিষয় পড়ার পরও ছাত্ররা তাতে ভাল কোন ফল করতে পারছে না।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : স্যার, আপনি যে প্ল্যানিং-এর বিষয়ে বারবার বলছেন তা কেমন হওয়া উচিৎ? দেখা যায়, আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা যখন সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে, তখনও বাংলা বা ইংলিশ ভাবসম্প্রসারণ করতে বললে তারা গাইড বই থেকে মুখস্থ করে পড়া দিচ্ছে। নিজে থেকে লিখতে পারছে না। এটা কি প্ল্যানিং-এর দুর্বলতা, নাকি এর জন্য শিক্ষক-ছাত্র উভয়ে দায়ী?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : মূল সমস্যা বোধ হয় কেবল প্ল্যানিং নয়; বরং প্ল্যানিং কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে তার কোন ফলোআপ না থাকা। প্ল্যানড এ্যাপ্রোচ হ'ল প্ল্যানিং-এর সাথে সাথে ফলোআপ থাকা। নইলে তাকে পূর্ণ প্ল্যানিং বলা যায় না। প্ল্যানিং-এর কথা আমরা বারবার বলছি এই কারণে যে, কোন কাজে আমাদের রিসার্চ বা যথেষ্ট প্ল্যান নেই বলেই আমাদের দেশের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নাই। আমাদের কারো চাকুরী যায় না। আবার যারা একটু-আধটু প্ল্যান করেন, তারা আবার প্ল্যান বাস্তবায়ন হয় না বলে বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে যান। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের স্ট্রং হওয়া দরকার।

আর পরের যে বিষয়টি বললেন, সেক্ষেত্রে আমি বলব, শিক্ষকরা চাইলেই বাচ্চাদের দিয়ে এটা করিয়ে নিতে পারেন। কেননা প্রতিটি নতুন আবিষ্কারই তৃপ্তিদায়ক। ছাত্ররা নিজেরা পড়বে এবং নিজের মেধা খাটিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিবে। উন্নত বিশ্বে এইটার খুব চর্চা হয়। তাদের সামনে বই খুলে দিলেও তাতে তারা কিছুই খুঁজে পাবেনা। বরং নিজের মত করে উত্তর দিতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সুতরাং এখানে শিক্ষকদেরই দায়িত্ব বেশী।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : আমাদের দেশে একজন মেডিকেল ছাত্র, যে কিনা পরবর্তীতে ডাক্তার হবে, তাকে বিসিএস দিতে গেলে দেখা যাচ্ছে এমন অনেক কিছু পড়া লাগছে যা তার ফিল্ডে আদৌ কোন কাজে লাগবে না। যেমন বাংলা, গণিত, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি তার কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়বে না। তবুও পড়তে হচ্ছে। এই বিষয়টি কিভাবে সমাধান করা যায়?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : বাহিরের দেশে এই ধরনের ফিল্ডে আলাদাভাবে পরীক্ষা হয়। মূল কথা হ'ল যে, যে বিষয় পরীক্ষা দিবে সে সেই বিষয়ে পড়বে। স্পেশাল বিষয়গুলোতে যেমন মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপত্যবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্নতর পরীক্ষা সিস্টেম রাখতে হবে। কমন লার্নিং গোল-এর উপরই পরীক্ষা হওয়া উচিৎ। সঠিক ও গোছালো পরিকল্পনা না থাকার কারণেই আমাদের দেশে এই সমস্যাগুলো পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : স্যার, এবার আপনার কাছে জানতে চাইব যে, প্রাইমারী ও হাইস্কুল লেভেলে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিভাবে আমরা আরো উন্নতি করতে পারি? এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের দায়িত্ব কী হবে?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : একাধিক বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। **প্রথমতঃ** শিক্ষকদের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেউ বলতে পারবে না যে, আমার টিচিং মেথড শতভাগ উপযুক্ত। এটা যদি কেউ বলে তাহলে সে ঠিক পথে নেই। সুতরাং শিক্ষকরা নতুন নতুন কী মেথড টিচিংয়ে আনতে পারছেন, তাদের দক্ষতা, কার্যকারিতা, পাঠদান প্রস্তুতি, কনটেন্ট আপডেট করার দক্ষতা, উদ্ভাবনী চিন্তা ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠানকে খুব ভালভাবে খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের একটা বাজেট থাকতে হবে এই কোয়ালিটি উন্নয়ন সেক্টরকে স্ট্রং করার জন্য। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও শেখার আগ্রহ থাকতে হবে। বাহিরের দেশে একজন শিক্ষক লেকচার দেয়ার সময় তার কলিগরাও কখনো কখনো ক্লাসে এসে বসেন এবং তার টিচিং পারফরমেন্স পর্যবেক্ষণ করেন। শিক্ষকদের যাচাইয়ের জন্য তার আচার-আচরণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে পূর্ব থেকেই ছাত্রদের কাছে অনেকগুলি প্রশ্ন দেয়া হয়। সেই মোতাবেক ছাত্ররাও কমেন্টস করে। পরে ছাত্রদের কমেন্টসগুলো আবার এ্যানালাইসিস করা হয়, শিক্ষকের সাথে শেয়ার করা হয়। ফলে একজন শিক্ষক জানতে পারছে যে তার দুর্বলতাটা কোথায়, উন্নতি কোথায় করতে হবে। এগুলো একজন শিক্ষককে খুব সহজভাবে নিতে হবে। ইগোকে দমন করতে হবে। কেননা যদি আমি ঠিকভাবে না পড়াই তবে আমার চাকরি চলে যেতে পারে। আমি একটা জবাবদিহিতার মধ্যে রয়েছি, যা ইচ্ছা তাই আমি করতে পারি না- এই অনুভূতি শিক্ষকের মধ্যে থাকতে হবে। এই ধরনের চেক এ্যাণ্ড ব্যালান্সের পরিবেশ যেখানে থাকে, সেখানেই সহজে শিক্ষকদের কোয়ালিটি ডেভেলপ করে। শিক্ষার্থীরাও যা চায়, তাই পায়। তারাও দক্ষ হয়ে গড়ে ওঠে। **দ্বিতীয়তঃ**

ছাত্রদেরকেও জবাবদিহিতার মধ্যে রাখতে হবে। তারা লার্নিং গোল অনুযায়ী কি শিখল, কতটুকু শিখল, তা নির্ণয় করার জন্য উন্নত বিশ্বে তাদের এক্সিট ইন্টারভিউ পর্যন্ত নেয়া হয়। মূল কথা হ'ল, শিক্ষক-ছাত্র সবাইকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখতে হবে। আর তাদের বুঝাতে হবে যে, আমরা যেটা করছি সেটা তোমার লাইফ স্টাইল ভালো করবে। আমি যেটা পড়াচ্ছি সেটা কাজে লাগবে। দুঃখের বিষয় যে, আমাদের ছাত্ররা জানে না যে, সে তার লেখাপড়া দিয়ে কি করবে? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু ভাল রেজাল্টের দিকে বেশী মনোনিবেশ করা হয়; কিন্তু কোয়ালিটির দিকে নযর থাকে না। ইনপুট এবং আউটপুটের দিকে প্রতিটি শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে। তবেই কার্যকর ফল পাওয়া যাবে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আমাদের দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সর্ম্পকে আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে কি?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমার অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না। দেশে এসে কিছু কিছু মাদ্রাসা পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছে। আমি একটি নৈশ মাদ্রাসায় ক্লাসও করছি। সেখানে মিশকাত পড়ানো হয়, এসো আরবি শিখি বই পড়ানো হয় ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমি এতটুকুই বলব, আমাদের দেশ মুসলিম দেশ। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা কারিকুলাম কিভাবে সাজানো? আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচারনীতি সবকিছুই পরিচালিত হচ্ছে পশ্চিমা নিয়মে। এখানে ইসলামের কোন উপস্থিতি নেই। কারণ যারা প্ল্যানিং-এর দায়িত্বে আছেন, তারা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত নন, বরং সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত। ফলে তারা তাদের মত করে রাষ্ট্রের মূল জায়গাগুলো পরিচালনা করছেন। অপরদিকে যারা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের কোন অর্থনৈতিক দক্ষতা নেই, বিজনেস স্কিল নেই, ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা নেই, কোন এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানোর দক্ষতা নেই। কালচারাল ফিল্ডে কিছু করার নেই। লিগ্যাল ফিল্ডে কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু এসব ফিল্ডে ইসলাম বাস্তবায়ন করতে গেলে সেই ধরনের লোক লাগবে যারা দ্বীন সম্পর্কে জানেন এবং অন্যান্য দক্ষতাও যাদের আছে। কিন্তু যারা ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করছে, তারা ঐ সকল ফিল্ডে যেতে পারছে না। ফলে কোন ভূমিকাও তারা রাখতে পারছে না।

আমাদের মাদ্রাসার ছাত্ররা দাওরা শেষ করছে ১৮/২০ বছর বয়সে তথা মাত্র ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে। অথচ সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানে এরপর আরো ৪/৫ বছর বিভিন্ন বিষয়ে আলাদাভাবে শিক্ষাদান করা হয়। মাদ্রাসার ছাত্ররাও অনুরূপ কোন একটি বিষয় নিয়ে পড়ুক। তাহলে সে দ্বীন নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে, দ্বীনদার পুলিশ হতে পারবে, দ্বীনদার ডিসি হতে পারবে। এগুলো ছাড়া তো সমাজ চলবে না। অপরদিকে যারা বিভিন্ন সেক্টরে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন, তাদেরকে দ্বীন শেখাবে কে? আমাদের মাদ্রাসাগুলোর ত্রুটি হ'ল, তারা এই সেক্টরগুলোর মানুষদের জন্য দ্বীন শিক্ষার কোন পরিকল্পিত কাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি। বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে **কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম** রয়েছে, যেখানে সমাজের মানুষের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী, ১/২/৩ মাসের প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। ফলে ছাত্ররাই কেবল নয়, বরং বাইরের সাধারণ মানুষের কাছেও তারা জ্ঞানকে পৌঁছে দিতে পারছে। ফলে তাদের ওয়ার্কফোর্স কোয়ালিটি ওভারঅল বাড়ছে। কিন্তু আমাদের দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই দিকটি অবহেলিত রয়েছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়েছি, আমি দ্বীন শিখতে চাইলে প্রফেশনালী কন্ডাকটেড কোন প্রোগ্রাম আমার জন্য রয়েছে মাদ্রাসাগুলোতে? নেই। এই ধরনের প্রোগ্রাম যদি আমাদের প্রতিটি মাদ্রাসায় থাকতো, তাহলে সমাজের সাধারণ মানুষ তাদের সাধারণ ইসলামী জ্ঞানের চাহিদা মেটাতে পারত সহজেই। অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবেও মাদ্রাসাগুলো লাভবান হ'তে পারত! তাছাড়া দুঃখের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার মধ্যে পারস্পরিক কোন আদান-প্রদান নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাদ্রাসাগুলোর কি কোন কিছুই নেওয়ার নেই? আবার মাদ্রাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুই নেওয়ার নেই? কেন এমনটা হ'ল? বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্রং রিসার্চ মেথোডলজী আছে। এটা কি মাদ্রাসাগুলো নিতে পারে না? আবার মাদ্রাসাতে সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য যে একাডেমিক অবজেক্টিভিটি আছে সেটা কি বিশ্ববিদ্যালয় নিতে পারে না? এই আদান-প্রদানগুলো না থাকার কারণে একটা ডাইকোটোমাস বা পরস্পরবিরোধী সমাজ তৈরী হচ্ছে। যেখানে জেনারেল শিক্ষিতরা ধর্মের কিছুই জানছে না। আবার যারা ধর্ম শিখছে তারা দুনিয়ার কিছু জানছে না।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *স্যার! বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় দুনিয়াবী জ্ঞান তো পরের কথা, দ্বীনী জ্ঞানই বা কতটুকু শিখতে পারছে শিক্ষার্থীরা সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। কেননা কওমী মাদ্রাসার ছাত্ররা বছরের পর বছর ধরে একই সিলেবাসে পড়ছে। যেখানে আধুনিকায়ন খুব কমই হয়েছে। আবার আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাসে দ্বীন শিক্ষার সুযোগ দিন দিন সীমিত করা হচ্ছে। সেখান থেকে প্রকৃত আলেম তেমন কেউ বের হচ্ছে না। এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার কোন উপায় আছে কী?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : মূলতঃ মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলাম নিয়ে নতুনভাবে রিসার্চ করা দরকার। এখান থেকে আমরা ধর্মীয় জ্ঞান কতটুকু অর্জন করতে পারছি। যারা আলেম হতে চায় তারা কতটুকু জানবে এবং যারা নির্দিষ্ট লেভেলের পর অন্যান্য পেশায় যাবে তারা কতটুকু দ্বীন শিখবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। মূলতঃ কারিকুলামের উপর নিয়মিত কাজ করা যরূরী। বাইরের দেশে প্রতি বছর সামাজিক গবেষণা ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেক হোল্ডার্সদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষা কারিকুলাম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়। একদল গবেষক এটি নিয়ে সবসময় কাজ করে। সুতরাং সমকালীন চাহিদা ও প্রত্যাশিত

জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় করে যুগোপযোগী কারিকুলাম তৈরী করা অতীব যরূরী।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : একজন আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী কেমন হওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আদর্শ শিক্ষকের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। **প্রথমতঃ** যখন একজন শিক্ষক এই পেশায় আসেন তখন এটাকে ভালোবাসতে হবে। তার আরো অনেক অপশন ছিল যেখানে না গিয়ে তিনি এখানে এসেছেন। নিশ্চয়ই তিনি এটাকে ভালোবাসেন। তার একটা বিশেষ আগ্রহ আছে। বেসিক কোয়ালিফিকেশন আছে। তাঁর আচরণ এমন থাকা উচিৎ যে, আমাকে প্রতিনিয়ত উন্নতি করতে হবে। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়িত্ব রয়েছে আদর্শ শিক্ষক তৈরীর জন্য। বাইরের দেশে নতুন কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হ'লে তার জন্য একজন সিনিয়র শিক্ষককে মেন্টর বা পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি তাকে নিয়মিত গাইড করেন। **দ্বিতীয়তঃ** শিক্ষকদেরকে এমন হ'তে হবে যাতে ছাত্ররা তাদের সাথে সহজে মিশতে পারে। ছাত্ররা যেন তার ঐ ক্লাসে উপস্থিত থাকার জন্য উদগ্রীব থাকে। তারা যেন মনে করে যে, আমি এখান থেকে কিছু অর্জন করতে পারছি, শিখতে পারছি। **তৃতীয়তঃ** টিচারকে অনেক স্টাডি করতে হবে। তার কন্টেন্ট অর্থাৎ পড়ানোর বিষয়গুলো নিয়মিত আপডেট করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কোন শিক্ষক একটা নোট দিয়ে অনেক বছর ধরে পড়িয়ে যাচ্ছেন। এভাবে পড়ালে দেখা যাবে যে, সে একসময় ছাত্র হারিয়ে ফেলবে। আমি একটা মাদ্রাসা দেখলাম, যেখানে শুরুতে ২৫ জন ছাত্র ছিল। পরে ছাত্ররা চলে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আর মাত্র একজন ছাত্র আছে। কিন্তু এ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের কোন মাথা ব্যথা নেই। আমি বললাম যে, আপনাদের এটা কি ধরনের প্রতিষ্ঠান? তাদের কোন দায়িত্ববোধই নেই। যেন তাদের কোন দোষই না। সব দোষ ছাত্রদের। একজন বড় আলেমের ক্লাসের কথা শুনেছি যার ক্লাসে গড়ে ৮/৯শ ছাত্র বসে। কিন্তু ক্লাস শেষে দেখা যায় শ'খানেক ছাত্র অবশিষ্ট আছে, বাকীরা বরকতের জন্য এসে তারপর চলে গেছে। এটা কোন ক্লাস হ'ল? তিনি তাঁর বহু পুরোনো নোটগুলো ক্লাসে বের করে পড়ান। এটা তো শিক্ষকতা নয়। তার কোন আপডেট নেই, কোন উন্নতির চেষ্টা নেই। একজন আদর্শ শিক্ষককে অবশ্যই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করতে হবে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : আপনি নিজে শিক্ষকতা করার সময় কিভাবে ক্লাসের প্রস্তুতি নিতেন এবং কি কি বিষয় অনুসরণ করতেন?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমি যে বিষয়ে লেকচার দেব, সে বিষয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করতাম। সে বিষয়ে নতুন নতুন কী গবেষণা হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা নিতাম। আর লেকচারের বিষয়টি সবসময় স্টুডেন্টদের জীবন অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতাম। আমার প্রচেষ্টা থাকত ছাত্রদেরকে এটা বোঝানো যে, আমি যেটা পড়াচ্ছি সেটা তাদের কাজে লাগবে। শিক্ষকতার জন্য প্রচুর পড়াশোনার মধ্যে থাকা দরকার। নিজেকে আপডেট রাখার জন্য চেষ্টার দরকার। একটা হ'ল বিষয়ের আপডেট, আরেকটা হ'ল কিভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করব তার আপডেট। আর আজকের যুগের ছাত্রদের সাথে মিশতে গেলে একটা নেতৃত্ব বা লিডারশীপের ব্যাপার আছে। গুড লিডার কোন নেগেটিভ বিষয় উপস্থাপনের সময়ও অপরের মর্যাদাকে খাটো করে না। কারণ একটা মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিস হ'ল তার সম্মান। সে জিনিসটাকে আঘাত করা যাবে না। কোন ছাত্রকে বোকা বলা বা তাকে দিয়ে কিছু হবে না- ইত্যাদি বলে যদি হীন করা হয়, তবে সেটা কখনই শিক্ষকদের জন্য সঠিক এ্যাপ্রোচ নয়। একটা ছাত্র যদি কোন কারণে ভালো ফলাফল না করতে পারে, তবে তাকে নিরুৎসাহিত করা যাবে না। তার সম্মানহানি করা যাবে না। সবসময় মনে রাখতে হবে আমার নিজের যেমন আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে, তেমনি তারও রয়েছে। আমি যেমন অপমানিত হতে চাই না, সেও অপমানিত হতে চায় না। সুতরাং একজন আদর্শ শিক্ষক অবশ্যই ছাত্রদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন, শত্রুসুলভ নয়। আমি শিক্ষকতাকালীন সময়ে এ বিষয়গুলোই বেশী বেশী অনুসরণ করতাম।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : স্যার! আপনার জীবনের বিশেষ কোন স্মৃতি আছে কি না, যেটা এখানে উল্লেখ করার মত?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : নিজের জীবন তো অনেক এলোমেলো। কোনকিছুই প্ল্যানমাফিক হয়নি। যেমন আজ এই যে আমি রাজশাহীতে আসলাম। আমার অবাক লাগে। অনলাইনে দেখলাম যে, রাজশাহীতে একটা সম্মেলন হবে। ভাবলাম দেখে আসি। তারপর মাদ্রাসায় আসলাম। আমার যে আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ হবে- এমন কোন পরিকল্পনা মাথায় ছিল না। এত বড় মাপের মানুষ তিনি। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হতে পারে- এমন কোন চিন্তাই মাথায় আসেনি। কেমন করে যেন উনার সাথে দেখা হয়ে গেল। কেমন করে আবার এখানে আসলাম। উনার বই পেলাম। থিসিস অনুবাদ করলাম। এসব কিছুই পরিকল্পনামাফিক ছিল না। তাকদীরই যে আমাকে এখানে টেনে এনেছে, তা এখান থেকে সুস্পষ্ট। আমার কন্ট্রোলে যেন কিছুই নেই। স্টুডেন্ট লাইফেও আমি জানতাম না আমি কি পড়ব। প্রথমে মেডিকেলের ছাত্র ছিলাম। ভাল লাগল না। তারপর মেরিনে গেলাম। সেখানেও তৃপ্তি পেলাম না। তারপর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএ-তে ফাইন্যান্সে পড়লাম। সেখানে আমি একটা হোস্টেলে থাকতাম, যার আশেপাশে মার্কেটিং-য়ে পিএইচ.ডি রত ছাত্ররা থাকত। আমি তাদের সাথে গল্পগুজব করতাম। সেখানে রাশিয়ান ছিল, সাউথ কোরিয়ান ছিল, নানান দেশের ছাত্ররা ছিল। তাদের সাথে

আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তাদের সাথে ঘুরাফেরা করতে করতে তাদের সাথে তাদের ক্লাসেও গিয়েছি। সেসময় মনে হ'ল মার্কেটিং-ই তো ভাল। পরে এই বিষয়েই এমবিএ, পিএইচ.ডি করলাম। এইভাবে জীবনটা আমার অজান্তেই নানা পথে বাঁক নিয়েছে, যার কোন কন্ট্রোল আমার হাতে ছিল না।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : আপনি তো পূর্ব থেকে আহলেহাদীছ বা সালাফী মানহাজের ছিলেন না। কিভাবে পরিচয় হ'ল এই মানহাজের সাথে?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ কী, এদের আক্বীদা কী- এই আলোচনাটাই আমার কাছে অবাক লাগে। আমি বিভিন্ন দেশে মুসলিম ভাইদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছি। একেবারে নর্থ আফ্রিকার মৌরিতানিয়া থেকে শুরু করে আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মিসর, সুদান, কাতার, সঊদী আরব, কুয়েত, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক, আযারবাইজান, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া; ওদিকে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের মানুষদের সাথে আমার হরহামেশা চলাফেরা ছিল। তাদের সাথে নিয়মিত ছালাত আদায় করেছি। বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারে গিয়েছি। সব জায়গাতে আমি দেখেছি ছালাতে জোরে আমীন, রাফঊল ইয়াদায়েন হচ্ছে। আবার জামা'আতে ছালাতের পর মুনাজাত হচ্ছে না। জুমআ'র খুৎবা হচ্ছে ইংরেজী ভাষায়। এটাই তো আমি নরমাল জেনে এসেছি। যখন দেশে ছিলাম তখন হয়ত হানাফী তরীকায় ছালাত আদায় করতাম। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার পর যখন দেখলাম এত দেশের মানুষ যখন এভাবে ছালাত আদায় করছে, তো আমিও এভাবে ছালাত করি। আমেরিকার অধিকাংশ স্টেটে আমি গিয়েছি, একই তরীকায় ছালাত সবজায়গায় দেখেছি। মেক্সিকোতে গেলাম, খুৎবা স্প্যানিশ ভাষায় হচ্ছে, সবই একই জিনিস। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো মোটামুটি সব ঘুরেছি। সেখানেও ছালাত একই পেয়েছি। চীনের সাংহাইতে গিয়েছি, সেখানেও চাইনিজ ভাষায় খুৎবা হয়, জোরে আমীন বলে। সুতরাং এটাই আমাদের কাছে কমন প্রাকটিস মনে হয়েছে। ২০১৮ সালে আমি দেশে ফিরলাম। তাবলীগের ভাইদের সাথে সময় লাগালাম, এক পীরের দরবারেও গেলাম। তারপর বুঝতে পারলাম ছালাতের পার্থক্যটা এদেশে কত বড় সমালোচনার বস্তু। এটা নিয়ে কত হুলুস্থুল কাণ্ড হয়। এই সমালোচনাগুলো আমার কাছে খুবই অপ্রিয় ও হতাশাজনক লাগল। এমনকি আমাদের বাড়ির পাশে একটা বড় মসজিদ আছে, আমি নাম বলছি না। সেখানে পাকিস্তান থেকে অনেক বড় বড় আলেম আসেন। সেখানে একজন বড় নামকরা আলেমের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, এটা জোরে আমীন বলা মসজিদ না। যে জোরে আমীন বলে তাকে বের করে দাও'। আমি মনে মনে বললাম, এটা কিভাবে সম্ভব যে, দুনিয়ার সব মুসলমানদের তুমি মসজিদ থেকে বের করে দেবে! তাছাড়া বিদেশে আমরা জুম'আর খুৎবা শোনার জন্য অপেক্ষা করতাম। নতুন কিছু শিখব এই আকাংখা নিয়ে যেতাম। কিন্তু দেশে এসে এসব কিছুই দেখি না। ফলে এটাই আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হ'ত। পরে তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সন্ধান পেয়ে গেলাম। তবে বিদেশে আহলেহাদীছ শব্দটা আমি শুনিনি। বরং তারা নিজেদের সালাফী বলে। এরপর যখন আমীরে জামা'আতের পিএইচ.ডি থিসিসটা পড়লাম, তখনই আমার আহলেহাদীছ সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণাটা আসল। তারপর এটার অনুবাদে হাত দিলাম। কেননা আহলেহাদীছ সম্পর্কে মানুষের বহু ভুল ধারণা আছে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ কিভাবে হ'ল?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : সম্ভবতঃ ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১২/১৩ তারিখে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবের উদ্যোগে আয়োজিত একটি সম্মেলনের পোস্টার আমি ইন্টারনেটে পেলাম। ভাবলাম ঘুরে আসি। তো রাজশাহীতে আসব বলে ইন্টারনেটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ওয়েবসাইটে গেলাম, মাদ্রাসার ছবি দেখলাম। তখন ভাবলাম মাদ্রাসাটা দেখে আসি। কারিকুলাম সম্পর্কে জেনে আসি। তো রাজশাহীতে এসে আমি নওদাপাড়া মাদ্রাসার গেটে আসলাম। গেটম্যান আমাকে মাদ্রাসা অফিসের দিকে দেখিয়ে দিল। সেখানে শামসুল আলম ছাহেবের সাথে দেখা হ'ল। তারপর মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলামের সাথে দেখা হ'ল। আমাকে বললেন, চলেন আমীরে জামা'আতের সাথে দেখা করে আসি। উনার সাথে আমার কখনও দেখা না হ'লেও ইন্টারনেটে অনেক লেকচার শুনেছি। উনার লেকচার খুব ভাল লাগত। আসলে উনি তো একজন বড় স্কলার। আমি তাদেরকে বললাম এত বড় একজন স্কলারের সাথে দেখা করবো? তিনি গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তাঁর ডিস্টার্ব হয় কি-না। তারপর তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি তখন খুব ব্যস্ত ছিলেন লেখালেখিতে। এর মধ্যেও তিনি আমাদের লাঞ্চ করালেন। খুব মহব্বতের একটা আতিথেয়তা পেলাম। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম এ কারণে যে, উনি আমাদের চেনেন না। একদম নতুন আগন্তুক আমরা। তিনি আমাকে অনেকগুলো বই গিফট করলেন। প্রায় ৩০টির মত। আমি তো অবাক হলাম। এতগুলো বই তিনি আমাকে দিলেন! এরপর সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে ঢাকা ফিরলাম। পরে তাবলীগী ইজতেমাতে এসে আরো মোটিভেটেড হলাম। তাঁর লেখা বইগুলো পড়তে থাকলাম। তাঁর থিসিসের উপর একটা বুক রিভিউ আমি লিখে ফেললাম। তাঁর নিকট পাঠালাম। তিনি পড়ার পর আমাকে ফোন করে ধন্যবাদ জানালেন। পরে তাঁর সাথে আমার মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হ'তে লাগল। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, আপনি আমার থিসিস ইংরেজীতে অনুবাদ করে দেন। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব। আমি ইতিপূর্বে কখনও অনুবাদের কাজ করিনি। পরে শুরু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ এখন কাজ প্রায় শেষের দিকে।

আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে, এই মাপের মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, একটা মহব্বতের সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। আমি এজন্য আল্লাহর একান্ত শুকরিয়া আদায় করি। কেননা এটা আমার প্রত্যাশার বাইরে ছিল। এটা যেন এক আকস্মিক স্বপ্নবৎ বিষয়।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : থিসিসের ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে আপনার অনুভূতি কেমন হয়েছে?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : হ্যাঁ, আহলেহাদীছদের ইতিহাস, আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট আলোচনা এখানে করা হয়েছে যে এখানে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকছে না। যেসব দলীল-প্রমাণাদি, সুবিস্তৃত তথ্যাদি সেখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো পড়ার পর আমাদের সঠিক আক্বীদা কি হওয়া উচিৎ তা যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি আমাদের পথভ্রষ্টতার কারণগুলো নির্ণয় করে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা সম্ভব হয়েছে। আহলেহাদীছদের যারা উপমহাদেশীয় পথপ্রদর্শক তাদের কথা আমার জানা ছিল না। থিসিস আমার সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। এগুলো আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে। নতুন কিছু জানার সুযোগ হচ্ছে। বিশেষ করে উনার উপস্থাপনা এত ক্লিয়ার এবং দলীলসমৃদ্ধ যে, কোন ব্যক্তি তা পাঠ করলে স্যাটিস্ফায়েড হয়ে যাবে। সুতরাং যদি এই গবেষণাটিকে আমরা আরো বৃহত্তর পরিসরে পৌঁছে দিতে পারি, তাহ'লে আরো বেশী মানুষ এখান থেকে উপকৃত হতে পারে। আর আমরা যদি এটা বিদেশী ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারি তাহলে এটা অনেক ভালো কাজ হবে ইনশাআল্লাহ।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : আমরাও ধন্য বোধ করছি যে আপনি থিসিসের ইংরেজী অনুবাদের কাজটা হাতে নিয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে অনুবাদের জন্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনি যে উচ্চমানসম্পন্ন অনুবাদ করেছেন, তা আমাদের প্রত্যাশার বাইরে ছিল, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর আপনার উপর রহম করুন। আমীন! স্যার! আপনি তো বাংলাদেশে একেবারে চলে এসেছেন, তো আপনার ভবিষ্যৎ প্ল্যান কী? আপনি কি কোথাও আর শিক্ষকতা করবেন?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : না। আমি আর সেক্যুলার ফিল্ডে মেহনত করতে চাচ্ছি না। যদি দ্বীনী ফিল্ডে সুযোগ থাকে, তাহ'লে আমি করব ইনশাআল্লাহ।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : এখন আপনি কী নিয়ে ব্যস্ত আছেন?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমি দ্বীনী শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছি। একটি নৈশ মাদ্রাসায় মিশকাত পড়ছি। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি ছিল কিতাবুল ইমারত বা প্রশাসন বিষয়ক। সেখানে ১২৬টি হাদীছ ছিল। এগুলো পড়ার পর মনে হ'ল আমাদের শিক্ষিত মহল তো এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানে না। তখন আমার মনে হ'ল এই হাদীছগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে একত্রিত করে একটা সুন্দর ভূমিকা লিখে যদি শিক্ষিত মহলে উপস্থাপন করা যায়, তাহ'লে তাদের জন্য অনেক উপকার হবে। এই লক্ষ্যে আমি ১২৬টি হাদীছ থেকে কেবল ছহীহ আর হাসান হাদীছ বের করলাম। এতে মোট ৮৮টি হাদীছ পাওয়া গেল। এই হাদীছগুলোকে আমি ১০টা ভাগে ভাগ করলাম এবং প্রতিটি অধ্যায়ের একটা সারসংক্ষেপ তৈরী করে সমসাময়িক পরিস্থিতির সাথে এর একটা মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি এগুলো সবার জানা দরকার। বিশেষ করে প্রশাসক, বিচারক এবং সাধারণ মানুষ সকলের জন্য হাদীছগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এরপর মিশকাতের কিতাবুল আদাব বা শিষ্টাচারের হাদীছগুলো নিয়েও আমার একই ধরনের কাজ করার আগ্রহ আছে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : জাযাকাল্লাহ খাইরান। আল্লাহ আপনার মেহনত কবুল করুন- আমীন! আমাদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে কি?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : বক্তব্য এতটুকুই যে, আমাদেরকে সবসময় ভাবতে হবে যে, দুনিয়াতে আমরা এমনভাবে জীবন-যাপন করব, যাতে আমাদের আখেরাতটা সুন্দর হয়। আখেরাতটাই আমাদের মূল গন্তব্য। সেটাই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়া যে কোন মুহূর্তে আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। দুঃখজনক বিষয় হ'ল, পশ্চিমা দর্শন আমাদেরকে এমন বস্তুবাদী বানিয়ে দিয়েছে যে, দুনিয়ার বাইরে ভিন্ন কিছু করার চিন্তা আমাদের মাথায় আসে না। আমি কেন দুনিয়াতে এসেছি, আমি কি দুনিয়ায় শুধু আনন্দ-ফূর্তি, আরাম-আয়েশ করতে এসেছি? তবে কি দুনিয়াতে বাড়ি, গাড়ি, টাকা-পয়সা এগুলোই আমাদের সব? এতেই কি সব সমস্যার সমাধান? না, দুনিয়া হ'ল পরীক্ষার স্থান। ফলাফল আখেরাতে। দুনিয়া এখন সর্বোচ্চ ভোগের দিকে ছুটছে। কিন্তু এর তো কোন সীমানা নেই। এর কোন নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ নেই। অর্জন করাও অসম্ভব। ফলে মানুষ হতাশায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। নিজেদের ব্যর্থ মনে করছে। সুতরাং কুরআন ও হাদীছের দিকে ফিরে আসা, আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসা- এটাই একমাত্র সমাধান।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : স্যার, আপনার এই সমৃদ্ধ টিচিং ক্যারিয়ার তো বহু মানুষের কাছে ঈর্ষণীয় এবং সোনার হরিণের মত। আমাদের শিক্ষিত সমাজে অনেকেই তো এমন ক্যারিয়ারেরই স্বপ্ন দেখেন। আপনি কেন এই ক্যারিয়ার থেকে ফিরে আসতে চাচ্ছেন? আর জীবনের এই পর্যায়ে এসে আপনি আমাদের ক্যারিয়ারের পেছনে ছোটা তরুণদের উদ্দেশ্যে কী বলবেন?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমি তো বলছি না যে দুনিয়াকে পরিত্যাগ কর। বরং হালাল পন্থায় উপভোগ কর। নিজের প্রাপ্যটুকু বুঝে নাও। কিন্তু নিজেকে হারাম, অন্যায়, অপকর্ম ও দুর্নীতির মধ্যে ডুবিয়ে নয়। এখন আমি জীবন নিয়ে খুব ভাবি। প্রথম দিকে দুনিয়াবী নানা লক্ষ্য অর্জনই ছিল আমার প্রধান চিন্তা। এখন মনে হয়, যদি আমার প্রাথমিক জীবনে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে পারতাম, তাহ'লে আমার জীবনটা কতইনা ভাল হ'ত! অনেক পরে এসে আমি এটা

বুঝেছি।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : কিন্তু আপনার আগের জীবনটা তো খারাপ ছিল না? বহু মানুষকে আপনি আপনার জ্ঞান দিয়ে উপকৃত করেছেন!

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকায় শরী'আতে সিদ্ধ নয়, এমন অনেক কাজ আমি করেছি প্রফেশনাল লাইফে। আমার টাকা-পয়সাগুলো অনর্থক খরচ করেছি। ভ্যাকেশনে সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি, প্যারিস, লণ্ডন ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে অনেক খরচ হয়েছে। এগুলো এখন আমার কাছে একদম অনর্থক মনে হচ্ছে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : স্যার! আপনার কথা শুনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নাস্তিক শিক্ষকের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, আমাদের জীবনের সব চাওয়া যখন পাওয়া হয়ে যাবে তখন কী হবে? কেননা সব চাওয়া পূরণ হয়ে গেলে, তারপরে মানুষের আর কোন কিছু চাওয়ার থাকবে না। তাহলে সবশেষে আর কী বাকী থাকবে? নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও তার এই প্রশ্ন সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আসলে সমস্ত চাওয়াকে পাওয়া হতে হবে- এটাই তো ইলুশন, ধোঁকা। কেননা কমার্শিয়াল দুনিয়ায় মানুষের চাওয়ার কোন শেষ নেই। কেননা কোন একটা চাওয়া যখন পূরণ হওয়ার পথে, তখন তার মনে নতুন নতুন চাওয়া তৈরী হচ্ছে। বর্তমানে মার্কেটিং-এর পলিসিই এমন যে, প্রতি মুহূর্তে তারা বেটার মডেলের জিনিস কাস্টমারের সামনে তুলে ধরছে, যেন সে কখনও পূর্ণ স্যাটিস্ফায়েড থাকতে না পারে। সবসময় তার মধ্যে একটা ডিম্যান্ড ক্রিয়েট করে রাখবে। ধরুন, আমি বাজারের সবচেয়ে আধুনিক একটা নতুন গাড়ি কিনে আনলাম। তারপরে কোম্পানী আমার গাড়ীর চেয়ে আরো অত্যাধুনিক গাড়ী বাজারজাত করল। ফলে অবচেতনভাবে কোম্পানী আমার মাথায় বেটার মডেলের গাড়ি কেনার কথা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এভাবে বস্তুবাদী দুনিয়া আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ধোঁকায় ফেলে দিচ্ছে। কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে আমাদের মনের প্রশান্তি নষ্ট করে দিচ্ছে। সুতরাং এটাই চিরন্তন সত্য যে, দুনিয়ার চাহিদার পিছনে পড়ে থাকা অর্থহীন। এটা কখনও আমাদের জীবনের লক্ষ্য হ'তে পারে না। বরং আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়া এবং আখেরাতের কামিয়াবী হাছিল করা।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দেয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। জাযাকাল্লাহ খাইরান।

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ

ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬১০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত লাইসেন্স নং রাজশাহী-৫৫১৮

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

খলীফা ওমর (রাঃ)-এর অনুশোচনা

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর যুগ খোলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগ ছিল। মুসলমানরা একের পর এক বিজয় অর্জন করছিল। সেই সময় খেলাফতের রাজধানী ছিল মদীনা। আমীরুল মুমিনীন মদীনাতে থাকতেন। তিনি যখন কোন সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন তাদের নির্দেশ দিতেন- যেন যুদ্ধের যাবতীয় তথ্য মদীনায় পাঠানো হয়। আরো নির্দেশ দিতেন, যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, সেটা যেন হেড কেন্দ্রে পৌঁছানো হয়।

আহনাফ বিন ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমরা কিছু লোক একবার মহান সুসংবাদ নিয়ে আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের নিকটে উপস্থিত হ'লাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এখন কোথায় অবস্থান করছ?'। আমরা বললাম, অমুক স্থানে। এরপর আমীরুল মুমিনীন আমাদের সেই তাঁবুর দিকে হাঁটা ধরলেন, যেখানে আমরা আমাদের উটগুলো বেঁধে রেখেছিলাম। আমাদের উটগুলো অনেক সময় ধরে ক্ষুধার্ত থাকার কারণে খুব ক্লান্ত ছিল। উটের অবস্থা দেখে আমীরুল মুমিনীন বললেন, 'তোমরা কি এই আরোহী প্রাণীর ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় পাওনা? তোমরা কি জানো না যে, এদেরও তোমাদের উপর হক্ব আছে? তোমরা এই উটগুলোকে কেন ছেড়ে দাওনি, তাহ'লে এরা যমীনে ঘাস খেতে পারত'। আমরা আরয করলাম, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! মহান বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আপনার কাছে চলে এসেছি, যাতে আপনাকে এবং মুসলিমদের তাড়াতাড়ি সুসংবাদ দিতে পারি। এজন্য আমরা রাস্তায় থামিনি'।

আহনাফ ইবনু ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমাদের কথা শুনে আমীরুল মুমিনীন ফিরে যেতে লাগলেন এবং আমরাও তার সাথে চলতে লাগলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে আসল এবং বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করেছে। আপনি তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন'। তার অভিযোগ শুনে আমীরুল মুমিনীন নিজের চাবুক বের করে তার মাথায় আঘাত করলেন এবং বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার! যখন ওমর মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত, তখন তোমরা অভিযোগ করতে থাক এবং বলতে থাকো- আমাকে সাহয্য করুন'। তার কণ্ঠ থেকে যেন উষ্মা ঝরে পড়ল। তখন সেই অভিযোগকারী নিজের প্রতি দোষারোপ করে ফিরে গেল। কিন্তু একটু পরেই ওমর (রাঃ) সেই অভিযোগকারীকে ডেকে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। যখন সে ফিরে আসল, তিনি সেই ব্যক্তির সামনে নিজের চাবুক রেখে বললেন, 'তুমি তোমার প্রতিশোধ নাও'। লোকটা বলল, 'না, আমি প্রতিশোধ নিব না। বরং আমি এটা আল্লাহ ও আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু ওমর (রাঃ) নাছোড় বান্দার মতো হয়ে বললেন, 'না, এমনটি হবে না। তুমি হয়ত আল্লাহ্র ওয়াস্তে মাফ করবে এবং এর প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে চাইবে। অথবা বিষয়টি আমার উপর ছেড়ে দিবে। তারচেয়ে তুমি তোমার বদলা নিয়ে নাও'।

কিন্তু লোকটা কোনভাবেই বদলা নিতে রাযী হ'ল না, বরং সে বলতে থাকল, 'আমি আল্লাহকে রাযী-খুশি করার জন্য আপনাকে মাফ করে দিয়েছি'। এরপর আমীরুল মুমিনীন সেখান থেকে প্রস্থান করে বাড়িতে চলে গেলেন। আমরাও সাথে ছিলাম। তিনি দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগলেন, يا ابن الْخَطَّابِ، كُنْتَ وَضِيعًا فَرَفَعَكَ اللهُ، وَكُنْتَ ضَالا فَهَدَاكَ اللهُ، وَكُنْتَ ذَلِيلا فَأَعَزَّكَ اللهُ، ثُمَّ حَمَلَكَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ فَجَاءَكَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِيكَ فَضَرَبْتَهُ، مَا تَقُولُ لِرَبِّكَ غَدًا إِذَا أَتَيْتَهُ؟ 'হে খাত্ত্বাবের সন্তান! তুমি এক সময় কত নীচ ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাকে মর্যাদা দান করেছেন। তুমি পথভ্রষ্ট ছিলে, আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। তুমি মর্যাদাহীন ছিলে, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তোমাকে মানুষের শাসক নিযুক্ত করেছেন। আর এখন যেই এক মাযলূম ব্যক্তি তোমার কাছে সাহয্যের আবেদন নিয়ে আসল, তখন তুমি তাকে মারলে? বল! যখন তুমি ক্বিয়ামতের দিন হাযির হবে, তখন তোমার রবের কাছে এর কি জবাব দিবে'। বর্ণনাকারী ইবনু ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমীরুল মুমিনীন এমনভাবে নিজেকে দোষারোপ করতে লাগলেন, আমার পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল যে, তিনি দুনিয়াবাসীর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি *(ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, (বৈরূত: দারুল ফিকার, ১৯৮৯খ্রি.) ৩/৬৫৩-৬৫৪; ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবু ওমর ১০৯ পৃ.; ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশক্ব ৪৪/২৯১-২৯২)*।

শিক্ষা:

১. আদর্শ নেতা বা শাসকের মাধ্যমে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামল তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

২. নেতা আল্লাহ্র কাছে যত জবাবদিহী মনোভাব পোষণ করবেন, তার মাধ্যমে শাসিতের জান-মাল তত বেশী নিরাপদ থাকবে।

৩. যারা মানুষের বিচার করে এবং তাদের উপর রাজত্ব করে, তাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাসী হ'তে হবে যে, তাদেরকেও একটি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

৪. এই ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায়, ইসলামী খেলাফতে প্রত্যেক মানুষের বাকস্বাধীনতা ছিল এবং তারা সরাসরি তাদের প্রেসিডেন্ট বা খলীফার কাছে বিচার চাইতে পারতেন।

৫. মুসলিম উম্মাহর জন্য নেতাদেরকে চৌকস হ'তে হবে। রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে তার জানা-শোনা থাকতে হবে।

৬. মানুষের প্রতি যুলুম করে কখনো আদর্শবান নেতা হওয়া যায় না। আদর্শ শাসক বা নেতা মানুষের অধিকারের পাশাপাশি পশু-পাখিদের অধিকার সংরক্ষণেও সদা সজাগ থাকেন।

৭. সর্বদা আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং নিজের ভুলের জন্য আল্লাহ্র কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে হবে।

-সুমাইয়া আখতার
নশিপুর (বালুপাড়া), গাবতলী, বগুড়া।

www.at-tahreek.com

দেশী পদ্ধতিতে সাম্মাম চাষে সাফল্য

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় প্রথমবারের মতো সঊদী আরবের মরু অঞ্চলের সাম্মাম ফল বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলালিংক জাতের তরমুজও চাষ করা হয়েছে। এরই মধ্যে দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিদিন সাম্মাম (তরমুজ জাতীয় হলুদ) ফল ও তরমুজ চাষ প্রকল্প দেখতে এবং নতুন ফল সম্পর্কে জানতে অনেকেই ভিড় করছেন। নতুন ফল দেখতে এসে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন অনেকেই। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, উন্নতমানের বীজ ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচর্যার কারণেই সাম্মাম ফল ও তরমুজের ফলন ভালো হয়েছে।

উপযেলা মোগড়া ইউনিয়নের আদমপুর গ্রামে দেশীয় পদ্ধতিতে প্রায় ১৫ বিঘা জমিতে সাম্মাম ফল ও বাংলালিংক নামের তরমুজ চাষ করেন মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম ও হবিগঞ্জের মাধবপুরের আমজাদ হোসাইন। চাষের প্রথম বছরই ঐ দুই কৃষক ব্যাপক সফলতা পান। প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ না হ'লে এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে সাম্মাম ফল ও তরমুজ বিক্রি থেকে যাবতীয় খরচ বাদে ৪ লাখ টাকার ওপর তাদের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, সাম্মাম সঊদী আরবের একটি পুষ্টিকর ও মিষ্টি জাতের ফল। এরই মধ্যে সাম্মাম ফলটি স্থানীয় মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ ফলের বাইরের অংশ হলুদ আর ভিতরের অংশ লাল। বীজ বপনের দুই-আড়াই মাসের মধ্যে সাম্মাম গাছে ফল আসে। তিন মাসের মধ্যে এ ফল পরিপক্ব হয়। এ ফলটি জমির মধ্যে ও মাচা তৈরি করে চাষ করা যায়।

স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, এ ফল মানুষের শরীরের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। পর্যাপ্ত পরিমাণ বিটা ক্যারোটিন রয়েছে, যা কমলার চেয়ে ২০ ভাগ বেশি। এছাড়া প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'সি' রয়েছে এ ফলে। আরও আছে পটাশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক, কপার, ম্যাঙ্গানিজ ও ম্যালেনিয়াম প্রভৃতি।

উপযেলার আদমপুর গ্রামে মুস্তাক্বীম ও আমজাদ হোসাইন সাম্মাম ফল, তরমুজসহ নানা প্রকার সবজি আবাদ করতে ২৬ বিঘা জমি বার্ষিক চুক্তিতে ইজারা নেন। সেখানে মায়ের দোয়া বহুমুখী কৃষি প্রকল্প নামে একটি খামার গড়ে তোলেন। ঐ কৃষি প্রকল্পের মধ্যে দেশীয় পদ্ধতিতে আড়াই বিঘা জমিতে সাম্মাম ফল ও ১২ বিঘা জমিতে তরমুজ আবাদ করা হয়। বাকী জমিতে তারা নানা ধরনের সবজি চাষ করেন।

আমজাদ হোসাইন জানান, সাম্মাম ফলটি মূলত সঊদী আরবের হ'লেও তারা ঢাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশীয় পদ্ধতিতে চারা করে আবাদ করেন। আড়াই বিঘা জমির মধ্যে সাম্মাম ফল ও ১২ বিঘা জমিতে বাংলা লিংক জাতের তরমুজের প্রায় ১৫ হাযার চারা রোপণ করা হয়। সাম্মাম ফল প্রতি ১০ গ্রাম বীজ দিয়ে ১৫ শতক জমি করা যায়। একইভাবে তরমুজও। প্রায় ১৫ বিঘা জমিতে সাম্মাম ও তরমুজ চাষ করতে সেচ, বীজ, চারা রোপণ, জমি ইজারা, পরিচর্যা, সারসহ অন্যান্য খরচ হয় তাদের প্রায় ৭ লাখ টাকা। এরই মধ্যে দেড় লাখ টাকার সাম্মাম ফল বিক্রি করা হয়েছে। আর ৫০ হাযার টাকার ওপর বিক্রি হয়েছে তরমুজ। তিনি আশা করছেন আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে জমির বেশির ভাগ সাম্মাম ফল ও তরমুজ বিক্রি হবে। সব মিলিয়ে সাম্মাম ফল বিক্রি হবে ৪ লাখ টাকার ওপর। আর তরমুজ বিক্রি হবে ৭ লাখ টাকারও বেশি। খরচ বাদে এ দুই ফল থেকে ৪ লাখ টাকার ওপর আয় হবে বলে তারা আশা করছেন। একেকটি সাম্মাম ফল দেড় থেকে দুই কেজির ওপরে হয়। পাইকারি দেড় শ এবং খুচরা ১৭০ টাকায় বিক্রি করছেন তিনি। পাশাপাশি তরমুজ প্রতি কেজি ৬০ টাকায় বিক্রি করছেন।

॥ সংকলিত ॥

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

কবিতা

প্রাচুর্য

মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইবরাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

দারিদ্রের চেয়ে প্রাচুর্য অনেক ভয়ংকর
প্রাচুর্য নষ্ট করে বহু মানুষের অন্তর।
প্রাচুর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকে শয়তান
কুক্ষিগত করে সম্পদ নষ্ট করে ঈমান।
প্রাচুর্য থেকে লোভের জন্ম মানুষের মনে
অপচয়-অপব্যয় করে তারা প্রতিক্ষণে।
আকাশচুম্বি দালানকোঠা ফেলে দীর্ঘশ্বাস
গরীব মানুষ সেখানে করে না বসবাস।
ধনীদের এঁটো খাবারে পরিপূর্ণ ভাগাড়
সেখানে ঝগড়া করে মানুষ হাড্ডিসার।
প্রাচুর্যের সাগরে অনেকে হাবুডুবু খায়
দান-ছাদাক্বা করে বলে আমাদের জানা নাই।
দীন-দরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষেরা ঘরে ঘরে
নিঃশব্দে নিভৃতে প্রতিদিন অনাহারে মরে।
সম্পদের অসম বণ্টনে হয় বড় পাপ
হে আল্লাহ! এ পাপ মোদের তুমি কর মাফ॥

জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

যাকারিয়া, ফুলবাড়িয়া, জগতি, কুষ্টিয়া।

দুনিয়া যে হরেক রঙের ধোঁকার জালে গাঁথা
ইহকালের ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে সবে বৃথা।
মদের নেশা পদের নেশা, নেশা নারীর প্রতি
গাড়ি-বাড়ির নেশায় পড়ে ছুটছে মানব জাতি।
নেশায় বুদ মানুষগুলি ছুটছে লক্ষ্যপানে
সোনার পাহাড় গড়েও তার সুখ আসে না মনে।
ভুরি-ভুরি সম্পদ যার সেতো আরো চায়
হরাম-হালাল নাহি বোঝে চক্ষু যেন নাই।
স্রষ্টাকে না স্মরে সে, দুনিয়াই তার সব
ধরার যত অর্থ-সম্পদ তার নিকটে রব।
সৃষ্টি করলেন যিনি মোদের করতে তাঁরই ইবাদত
তাঁকে ছেড়ে তাগূত্ব পূজা করছে মানুষ দিন-রাত।
ভুলেছে আজ আদম সন্তান পাক-কালামের ভাষা
ছেড়েছে সে ধরার মোহে জান্নাত পাবার আশা।
ভুলেছে রবের বাণী যাহা ছিল বান্দার প্রতি
দিশাহীন মানুষ এখন বোঝে না নিজ ক্ষতি।
আদম সন্তান চিন্তা কর, ভেবে দেখ বারবার
কি উদ্দেশ্যে তোমার সৃষ্টি লক্ষ্য কিবা তোমার?
মৃত্যু হ'ল পরম সত্য সবার জন্যে সমান
খুলে দেখ কুরআন-হাদীছ থাকতে তোমার প্রাণ।
জীবনের মূল উদ্দেশ্য এক আল্লাহ তা'লার ইবাদত
লক্ষ্য তোমার পরকালে চির সুখের জান্নাত।

করোনা থেকে বেঁচে লাভ কি?

শাকিলা তাবাস্সুম
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জয়পুরহাট ছিদ্দীকিয়া কামিল (এম,এ) মডেল মাদ্রাসা, জয়পুরহাট।

করোনা ভাইরাস তা কি চোখে দেখেছ?
সে কি দৈত্যাকৃতির বিশাল দেহী কোন জন্তু?
না-কি হিংস্র-ভয়ংকর কিছু?
এমন কিছুই সে তো নয়;
যার অস্তিত্বই তোমার দৃষ্টিগোচর নয়!
তবে এত ক্ষুদ্রের আবার কিসের ভয়?
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাসের আছে কি কোন সাধ্য?
জীবন নাশ করতে পারে আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত?
এটাতো প্রভুর শাস্তির ছোট্ট উদাহরণ!
মুত্তাক্বীরা এ থেকে করবে শিক্ষাগ্রহণ।
ভেবে দেখেছ কি একবার?
তুচ্ছ করোনার ভয়ে যখন এতটা সন্ত্রস্ত,
কবর ও জাহান্নামের ভয়ে তুমি কতটা ত্রস্ত?
করোনা থেকে বেঁচে লাভ কি বল
যদি অবিরত মরতে হয় মরণের পর?
কিভাবে বাঁচবে জাহান্নাম থেকে যা জ্বলবে নিরন্তর?
কথিত সুশিক্ষিত অন্ধ জ্ঞানীরা,
আল্লাহ্র গযবকে বলে দুর্যোগ,
করতে চায় মোকাবিলা, তারা কতটা নির্বোধ?
বিচার দিবসে রবে কি তারা হোম কোয়ারেন্টিনে?
শাস্তি থেকে পাবে পরিত্রাণ কোন সুরক্ষা মেনে?
'করোনা'কে নয়, ভয় করলে আল্লাহ্র কঠিন শাস্তি,
ক্ষমা করে দিবেন তিনি আমাদের ভুল-ভ্রান্তি।
আল্লাহ যেন ক্ষমা করেন আমাদের গুনাহ যত,
নেই ক্ষমতা তাঁর শাস্তি সহ্য করার মত।
হে প্রভু! লকডাউন করে দিন ইসলাম বহির্ভূত সব,
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক আল্লাহ্র সন্তোষ ও নাজাত।
ঘরে ঘরে পৌঁছবে তবেই হেদায়াতের বাণী,
চারিদিকে ছড়াবে অদম্য শক্তি ঈমানী।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

স্বদেশ

বঙ্গোপসাগরের সম্ভাব্য মওজূদ গ্যাস দিয়ে ১০০ বছরের চাহিদা মেটানো যাবে

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে তিন হাযার ১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে মোনাজাইট, জিরকন, রুটাইল, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ফসফরাস, সালফেট ও রেয়ার আর্থ এলিমেন্টসহ মূল্যবান খনিজ পদার্থের ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। সাগরের তলদেশে পাওয়া গেছে সম্ভাব্য ১০০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের মওজূদ, যা দিয়ে দেশের ১০০ বছরের চাহিদা মেটানো সম্ভব। বর্তমানে দেশে মাত্র ১৪ বছরের গ্যাস মওজূদ রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের ওশানোগ্রাফি বিভাগের সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মুহাম্মাদ যাকারিয়া বঙ্গোপসাগরের তলদেশে থাকা বিরল খনিজ সম্পদের ভূতাত্ত্বিক জরিপের ফলাফলে এসব তথ্য প্রকাশ করেছেন।

কক্সবাযারের পেঁচারদ্বীপস্থ বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও চ্যালেঞ্জ শীর্ষক সাম্প্রতিক এক সেমিনারে আলোচকরা বলেন, দেশের সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে হ'লে শুধু প্রযুক্তি উদ্ভাবন করলেই হবে না, সেই প্রযুক্তিকে মাঠ পর্যায়ে কাজে লাগাতে হবে। তবেই উপকৃত হবে জাতি।

বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শফীকুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ইতি রাণী পোদ্দার। সেমিনারে বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৯-২০ অর্থবছরের গবেষণা ফলাফলসহ মোট সাতটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে বঙ্গোপসাগরের রূপতত্ত্ব তুলে ধরেন ফিজিক্যাল ও স্পেস ওশানোগ্রাফি বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রূপক লোধ ও শাহীনুর রহমান।

বিদ্যুৎ ছাড়াই ৬০ লিটার অক্সিজেন দিবে অক্সিজেট

করোনা রোগীদের অক্সিজেনের চাহিদা পূরণ ও উচ্চগতির ভেন্টিলেশন নিশ্চিত করতে 'অক্সিজেট' নামে সিপ্যাপ ভেন্টিলেটর ডিভাইস তৈরি করেছে বুয়েটের বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একদল গবেষক। এই যন্ত্র অক্সিজেন সিলিণ্ডার ও মেডিকেল অক্সিজেনের সাথে সহজেই সংযুক্ত করে ব্যবহার করা যায়। বিদ্যুৎ ছাড়াই ৬০ লিটার পর্যন্ত অক্সিজেট প্রবাহ করা সম্ভব। দুই হাযার টাকায় তৈরি ডিভাইসটি বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ বিএমআরসির অনুমোদন নিয়ে দুই ধাপের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শেষ করেছে।

এই বিষয়ে বুয়েট বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. তাওফীক হাসান বলেন, যন্ত্রটি তৈরি করতে সব মিলিয়ে ২০ হাযার টাকা লাগবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কনসালটেন্ট ডা. খায়রুল ইসলাম বলেন, ওয়ার্ড আর আইসিইউতে আমরা ডিভাইসটির পরীক্ষা চালাচ্ছি। এটি খুব ভালো বিকল্প হ'তে পারে। কারণ বিদ্যুৎ ছাড়া ৬০ লিটার অক্সিজেন দেয়া যাবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন হ'লে বিদ্যুৎ ও অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি আইসিইউর ওপর চাপ কমবে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরুর পর তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে অনেক রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। কোভিড চিকিৎসায় হাই ফ্লো নেজাল ক্যানোলার চাহিদা বেড়েছে। যদিও যন্ত্রটির ব্যবহার জটিল ও ব্যয়বহুল। সাধারণ করোনা ওয়ার্ডে রোগীদের ১৫ লিটার পর্যন্ত অক্সিজেন সরবরাহ করা যায়। এর বেশি প্রয়োজন হ'লে দরকার হয় আইসিইউ বা এইচডিইউর।

ছিটমহল বিনিময়ের ৫ বছর : উন্নয়নের ছোঁয়ায় পাল্টে যাচ্ছে সার্বিক চিত্র

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বহুল কাঙ্ক্ষিত ছিটমহল বিনিময়ের পর ইতিমধ্যে ৫ বছর পার হয়েছে। ৫ বছরে ছিটমহলগুলোর চারিদিকে শোভা পাচ্ছে উন্নয়নের ছোঁয়া। ছিটমহলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিটমহল দাসিয়ারছড়া। নীলকমল নদী বেষ্টিত ছিটমহলটির আয়তন ৬.৬৫ বর্গকিলোমিটার, যার অবস্থান কুড়িগ্রাম যেলার ফুলবাড়ী উপযেলার ফুলবাড়ী সদর ইউনিয়ন, কাশিপুর ইউনিয়ন ও ভাঙ্গামোর ইউনিয়নের মাঝে বিদ্যমান। ২০১৫ সালের ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ হেট কাউটিং রিপোর্ট অনুসারে জনসংখ্যা ৬৫২৯ জন ও ১৩৬৪টি পরিবার রয়েছে।

৬৮ বছরে পিছিয়ে থাকা দাসিয়ারছড়ায় এখন শুধু উন্নয়ন চোখে পড়ে। অধুনালুপ্ত দাসিয়ারছড়া ছিটমহল হস্তান্তরে পরবর্তীতে ২৭ কি.মি. সড়ক পাকাকরণ করা হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে ব্রীজ, কালভার্ট। শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩টি, কলেজ ২টি, মাদ্রাসা ১টি, মসজিদ ৫টি, কমিউনিটি সেন্টার ২টি, কবরস্থান ১টি, মন্দির ১টি, টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে ৩৩৪টি। নির্মাণ করা হয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং ও ভিডিও কনফারেন্সের মত আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ১টি আইসিটি ভবন।

অন্যদিকে ভূমি জটিলতার বিষয়টি সম্পূর্ণ নিরসন হয়ে গেছে। দাসিয়ারছড়াসহ বিলুপ্ত ছিটমহলে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তির ৭৫ দিনের মধ্যে প্রায় ২ হাযার ৫৬২ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। দেয়া হয়েছে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ। ইউনিসেফের অর্থায়নে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী স্থাপন করেছে ১৫টি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে ১৪টি মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্র। উপযেলা কৃষি অফিসের অর্থায়নে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছে। দাসিয়ারছড়ায় ঘরে ঘরে সুপেয় পানি আর স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বেকার যুব ও যুব মহিলাদের দেয়া হয়েছে নানা ট্রেডে প্রশিক্ষণ।

উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর থেকে ছিটমহলবাসী নাগরিকত্বহীন হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে থাকে। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশের ১৬২টি ছিটমহলের বিনিময় ঘটে। সমাপ্তি ঘটে ১৬২ ছিটমহলের মানুষের ৬৮ বছরের বন্দিদশার। ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতের ১১১টি ছিটমহল এবং ভারতের অভ্যন্তরে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল স্ব-স্ব দেশের অভ্যন্তরে থাকা মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হয়। এতে বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয় ১১১টি ছিটমহল অপর দিকে ভারতের সাথে যুক্ত হয় ৫১টি ছিটমহল।

বিদেশ

করোনায় বাংলাদেশসহ ৫৭ দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ বেকার : গ্যালাপ

করোনা মহামারির কারণে বিশ্বে প্রতি দু'জনে একজনের আয় কমেছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক জনমত জরিপ প্রতিষ্ঠান গ্যালাপ বলছে, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মানুষ চাকরি হারিয়েছে অথবা তাঁদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশসহ ৫৭টি দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ বলেছে, মহামারিতে তাঁদের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ভারত, জিম্বাবুয়ে, ফিলিপাইন, কেনিয়া, এল সালভাদরের মতো দেশের মানুষও এই জরিপে অংশ নেন। তবে উন্নত ও উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছে, এমন মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। গ্যালাপ ১১৭টি দেশের তিন লাখ মানুষের ওপর এই জরিপ চালিয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে গ্যালাপ জানায়, করোনা মহামারির কারণে তাঁদের মধ্যে অর্ধেক মানুষের আয় কমে গেছে। গ্যালাপ বলছে, জরিপের এই পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে প্রায় ১৬০ কোটি মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে।

গবেষকরা এক বিবৃতিতে বলেন, আয় কমে যাওয়া বা চাকরি হারানোর এই হার থাইল্যান্ডে বেশি। দেশটিতে ৭৬ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে। আর সুইজারল্যান্ডে এই হার কম। দেশটিতে এই হার ১০ শতাংশ।

বলিভিয়া, মিয়ানমার, কেনিয়া, উগান্ডা, ইন্দোনেশিয়া, হন্ডুরাস ও ইকুয়েডরে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭০ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, মহামারির কারণে তাঁরা ঘরে বসে আছেন। আর যুক্তরাষ্ট্রে ৩৪ শতাংশ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

গ্যালাপ আরও বলছে, জরিপে অংশগ্রহণকারী অর্ধেকের বেশি মানুষ জানিয়েছেন, তাঁদের চাকরি অথবা ব্যবসা অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

মুসলিম জাহান

ফিলিস্তীনের উপর ইস্রাঈলী বিমান হামলা

গত ২৭শে রামাযান সোমবার ১০ই মে দিবাগত রাত থেকে বিশ্বের বৃহত্তম কারাগার ফিলিস্তীনের গাযা সিটির উপর বিমান হামলা শুরু করেছে ইস্রাঈল। রামাযানের শুরুতে আল-আক্বছা মসজিদের দামেস্ক গেইট বন্ধ করে দেওয়া, পূর্ব যেরুযালেমের শেখ জার্রাহ এলাকা থেকে ফিলিস্তীনী পরিবারগুলিকে উচ্ছেদ করা এবং আল-আক্বছা মসজিদে ছালাতরত মুছল্লীদের উপর পুলিশী হামলার পর প্রতিবাদী ফিলিস্তীনীদের কণ্ঠ রুখে দিতে বিমান হামলা শুরু করে ইস্রাঈল। হামলায় গত ১০ দিনে তথা ২০শে মে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ৩৮ জন নারী ও ৬৪ জন শিশু সহ মোট ২২৭ জন নিহত হয়েছে। যাদের মধ্যে রয়েছে গাযার পশ্চিমে শরণার্থী শিবিরে একই পরিবারের নিহত ১০ জন সদস্য। এছাড়া আহতের সংখ্যা দেড় হাযারের বেশী। শত শত বাড়ি-ঘর ধ্বংস ও অর্ধলক্ষ বাস্তুচ্যুত মানুষের আর্তচিৎকারে গাযার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ইস্রাঈলী বিমান হামলায় এপি ও আল-জাজিরার ১২তলা ভবন সহ এ পর্যন্ত ৪৫০টি ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়া সেখানকার বিদ্যুৎকেন্দ্র, ওয়াটার প্লান্ট, হাসপাতাল, খাদ্যগুদামসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস হওয়ায় লাখ লাখ ফিলিস্তিনী মানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

[আমরা এই বর্বর হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে দ্রুত এই হামলা বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। সাথে সাথে ৫৭টি মুসলিম দেশের সরকার ও অন্যান্য দেশের বিবেকবান মানুষকে মযলূম ফিলিস্তীনীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সর্বোপরি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন এই অভিশপ্ত ইহূদী সরকার ও তাদের সহযোগী পরাশক্তিগুলিকে নির্মূল করে দেন (স.স.)]

ডা. যাকির নায়েকের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ আবেদন তৃতীয়বারের মত প্রত্যাখ্যান করল ইন্টারপোল

ভারতের বিশ্বখ্যাত দাঈ ডা. যাকির নায়েকের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির অনুরোধ খারিজ করেছে ইন্টারপোল। এর মধ্য দিয়ে তিন বার ভারত সরকারের অনুরোধ খারিজ করে দিল ইন্টারপোল। ইন্টারপোল সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে অর্থ উপার্জন করা এবং তা অপ্রাসঙ্গিক জায়গায় খরচ করাকে আর্থিক দুর্নীতি বলা যায় না এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে ইন্টারপোল। তাই যাকির নায়েকের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির অনুরোধ খারিজ করা হয়েছে। ধর্মীয় বক্তব্য রাখার জন্য আর্থিক দান নেয়াকে অপরাধ বলে গণ্য করা যায় না বলেও সাফ জানিয়েছে ইন্টারপোল।

এ বিষয়ে ডা. যাকির নায়েকের আইনজীবী এস হরি হারাণ জানান, ইন্টারপোল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কপি তিনি হাতে পেয়েছেন। এই বিষয়ে অবশ্য এনআইএ'র মুখপাত্র কোন প্রতিক্রিয়া জানাননি। তবে এনআইএ সূত্রে খবর, এনআইএ ইন্টারপোলের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায়। তারপর তা পরীক্ষা করে ফের অনুরোধ জানাবে ইন্টারপোলকে। উল্লেখ্য, ড. যাকির নায়েক বর্তমানে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

করোনা শনাক্ত করবে মৌমাছি!

করোনার পরীক্ষায় নমুনা সংগ্রহ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ফল পেতে অনেকটা সময় লেগে যায়। অপেক্ষার এ সময় কমিয়ে আনতে গবেষণা করছেন নেদারল্যান্ডসের বিজ্ঞানীরা। এ জন্য তাঁরা দ্বারস্থ হয়েছেন মৌমাছির। দেওয়া হচ্ছে বিশেষ প্রশিক্ষণ। এসব মৌমাছি গন্ধ শুঁকেই শনাক্ত করতে পারবে কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের নমুনা।

নেদারল্যান্ডসের ওয়াজেনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-পশুচিকিৎসার গবেষণাগারে মৌমাছির এ বিশেষ প্রশিক্ষণ চলছে। সেখানে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের নমুনা শনাক্ত করতে দেওয়া হচ্ছে মৌমাছিকে। প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া মৌমাছিরা কোভিড-১৯ আক্রান্ত নমুনা শনাক্তের সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের স্ট্র-র মতো লম্বা ও সূক্ষ্ম শুঁড় প্রসারিত করতে পারছে, এমনটাই জানিয়েছেন এ গবেষণায় যুক্ত ভাইরোলজির অধ্যাপক উইম ভ্যান দের পোয়েল।

উইম ভ্যান দের পোয়েল বলেন, 'শুরুতে আমরা মৌয়ালের কাছ থেকে সাধারণ মৌমাছি সংগ্রহ করেছি। এরপর সেগুলো বিশেষ ব্যবস্থায় রেখেছি। এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পরে, প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মৌমাছিগুলোর সামনে করোনার পজিটিভ নমুনা রাখা হয়েছে। এর পরপরই সেগুলাকে দেওয়া হয়েছে চিনিযুক্ত পানি। দেখা গেছে, কোভিড-১৯ আক্রান্ত নমুনা শনাক্তের পরে মৌমাছিরা চিনিযুক্ত পানিতে তাদের শুঁড় বাড়িয়ে দিয়েছে।

এটা যেন অনেকটাই করোনা শনাক্তের পর মৌমাছিকে পুরস্কার দেওয়ার মতো। আক্রান্ত নমুনা ঠিকঠাক শনাক্ত করতে পারলে পুরস্কার হিসাবে মিষ্টিজাতীয় পানি পাচ্ছে মৌমাছিরা। আর শনাক্ত করতে না পারলে মিলছে না কিছুই।

গবেষকেরা বলছেন, প্রচলিত উপায়ে করোনা শনাক্তে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন সময় লেগে যায়। তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৌমাছি দিয়ে শনাক্ত করলে কয়েক সেকেন্ডেই ফলাফল পাওয়া যায়। এটি খুবই ব্যয়সাশ্রয়ী ও কার্যকর একটি প্রক্রিয়া। তবে এ প্রক্রিয়ায় করোনা শনাক্তের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সত্যতা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

সরিষাডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ১লা মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন সরিষাডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আলমডাঙ্গা থানার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সরিষাডাঙ্গা শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইয়াকূব হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসাইন ও আলমডাঙ্গা থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন থানা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসাইন।

কেশবপুর, যশোর ২রা মে রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কেশবপুর বাজারস্থ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কেশবপুর পৌর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কেশবপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান।

বজরপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ৩রা মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন বজরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ৪ঠা মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন কেশরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ ও 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন।অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ

বরুণা, ডুমুরিয়া, খুলনা ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার ডুমুরিয়া থানাধীন বরুণা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. ইবরাহীম হোসাইন খলীল। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণের পূর্বে কেন্দ্রীয় মেহমান উক্ত মসজিদের জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

আলোচনা সভা

যশোর ২৩শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন আল্লাহ্‌র দান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয তরীকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহীম।

মজপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ৫ই মে বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগমারা উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাস্টার এস এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ছানাবিয়া ২য় বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ ছিয়াম।

যুবসংঘ

'সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা : যুবকদের করণীয়'-শীর্ষক অনলাইন সেমিনার

১লা মে ২০২১ ইং শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয় শাখাসমূহের উদ্যোগে সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাসমূহ ও যুবকদের করণীয় শীর্ষক এক অনলাইন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর। সেমিনারে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব (বিষয় : হতাশা থেকে মুক্তির উপায়), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মীযানুর রহমান (বিষয় : চরমপন্থা রোধে যুবকদের করণীয়), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক আহ্বায়ক মুহাম্মাদ ফেরদাউস (বিষয় : সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধে যুবকদের করণীয়), ঢাকা দক্ষিণ সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মারুফ (বিষয় : শিক্ষার্থীরা অবসর সময়কে কীভাবে কাজে লাগাবে?), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অর্থ সম্পাদক আকমাল বিন আফযাল (তরুণদের আত্মকেন্দ্রিকতা : সামাজিকতার প্রতি

অনীহার কারণ ও প্রতিকার)। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক।

অনলাইন যুবসমাবেশ

পবিত্র রামাযানুল মুবারক উপলক্ষ্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে দেশব্যাপী 'পবিত্র রামাযান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। করোনা প্যানডেমিক এবং লকডাউনের কারণে অনলাইনে আয়োজিত এসকল সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবসহ কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ।

রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীমণ্ডলী জুম এ্যাপসের মাধ্যমে এসকল সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। এসময় দায়িত্বশীল ও কর্মীদেরকে সমাজ সংস্কারের ময়দানে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলার জন্য আহ্বান করা হয় এবং 'অহির আলোয় উদ্ভাসিত হোক বাংলার প্রতিটি ঘর' শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে তাওহীদ ও সুন্নাতের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া ও শিরক-বিদআ'তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তাকীদ প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি কর্মীদেরকে ব্যক্তিপূজা পরিহার করে ইখলাছসম্পন্ন, যোগ্য ও প্রকৃত কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য আহ্বান জানান এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সমকালীন ফেৎনা থেকে আত্মরক্ষা করা এবং দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে নিজেকে সর্বদা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর অবিচল রাখার জন্য তাকীদ প্রদান করেন। তিনি যেলা দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে সংগঠনকে শক্তিশালী করা, শাখা গঠন করা, যোগ্য কর্মী তৈরী করা, হাক্কুল ইবাদ বা সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি শাখা যদি তৃণমূল থেকে সমাজসংস্কারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তবেই এ দেশের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তথা বিশুদ্ধ ইসলামের বিপ্লব সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য শাখাসমূহকে সক্রিয় করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সর্বোপরি তিনি কর্মীদেরকে শৈথিল্যবাদ এবং চরমপন্থা পরিহার করে ইসলামের মধ্যপন্থা তথা ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

সোনামণি

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৯শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্যবিদ্যালয় জামে মসজিদে 'সোনামণি' মারকায এলাকার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকার প্রধান উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাসান মাহমূদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আরযুল ইসলাম শাফি। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায সূর্যমুখী শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম।

মহিলা সংস্থা

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ

গাংনী, মেহেরপুর ২রা এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টা হ'তে আছর পর্যন্ত যেলার গাংনী থানাধীন গাংনী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'-এর সভানেত্রী আনজুমান আরা সুলতানার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে ছিয়ামের গুরুত্ব ও করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গাংনী থানা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'-এর সভানেত্রী অধ্যাপিকা রোজিনা আফরোজা, আত্মশুদ্ধি ও ইখলাছ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মুজীবনগর থানার সভানেত্রী শারমীন আখতার ও তা'লীমী বৈঠক পরিচালনা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গাংনী শাখার সভানেত্রী সোনিয়া সুলতানা। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন সা'দিয়া ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করেন শামসুন নাহার। উক্ত সমাবেশে শতাধিক মহিলা সুধী ও দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

হালীমপুর, কেশবপুর, যশোর ২৯শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কেশবপুর উপযেলাধীন হালীমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। পর্দার অন্তরালে সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্যে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কেশবপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান ও অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা মীযানুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন কেশবপুর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শাহীনুর রহমান।

'আত-তাহরীক অনলাইন টিভি'র দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট

আত-তাহরীক অনলাইন টিভি গত ৭ই মে ২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক ১লা রামাযান ১৪৪০হিজরী, মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পর থেকে গত ৩০শে এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ৫৮৫টি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। তন্মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য ১৫৮ টি, টক- শো ১৪ টি, এ সপ্তাহের প্রশ্নোত্তর ২৪টি, মতবিনিময় ২টি, ইবাদতের বাস্তব প্রশিক্ষণ ৮টি, তা'লীমী বৈঠক ২১টি, হাদীছের গল্প ৫টি, ইসলামী জাগরণী ৯টি, নবীদের কাহিনী ৩টি, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ১টি, ছিরাতুল মুস্তাকীম ২টি, দৃষ্টিভঙ্গি ২টি, দো'আ শিখি ১টি, তারুণ্যের ভাবনা ১টি, সাক্ষাৎকার ১টি, সরেযমীন প্রতিবেদন ২টি, ইসলাম গ্রহণের গল্প ১টি, আরবী ভাষা শিক্ষা ক্লাস ২০টি এবং ফার্সী ভাষা শিক্ষা ক্লাস ১৯টি। এছাড়া প্রশ্নোত্তর, এ সপ্তাহের বিশ্ব, এক নযরে আত-তাহরীক, বিষয়ভিত্তিক শর্ট ভিডিও, অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত এবং রামাযানে প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। টক শো, প্রশ্নোত্তর ও বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব,** মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল, মুহাম্মাদ আখতার মাদানী, ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ড. নূরুল ইসলাম, ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা মুখলেছুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইহসান এলাহী যহীর, ফায়ছাল মাহমূদ প্রমুখ। আর আরবী ভাষা শিক্ষা ক্লাস নেয় ফায়ছাল মাহমূদ এবং ফার্সী ভাষা শিক্ষা ক্লাস নেয় মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : আযান ও এক্বামতের মধ্যে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। এক্ষণে এই ছালাত নারীদের জন্যও কি মুস্তাহাব?

-নাজমুল হুদা
রাজশাহী মহিলা কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত ছালাত নারীদের জন্যও মুস্তাহাব। কারণ ইসলামের কোন বিধান যদি কোন হাদীছ দ্বারা বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট না হয় তাহ'লে উক্ত বিধান সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয় *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/২৭)*।

প্রশ্ন (২/৩২২) : চাচা এবং মামারা কি মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ কুরআনে তাদের বিষয়টি উল্লেখ নেই।

-সাদিয়া আখতার মীম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : চাচা ও মামারা মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা মাহরামদের বর্ণনায় বোনের মেয়েকে ও ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল তোমাদের মা, মেয়ে, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনেয়ী *(নিসা ৪/২৩)*। তাছাড়া চাচা ফুফুর সমপর্যায়ভুক্ত এবং মামা খালার সমপর্যায়ভুক্ত। আয়েশা (রাঃ)-এর জনৈক দুধসম্পর্কীয় চাচা তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি ফিরিয়ে দেন। রাসূল (ছাঃ) বাড়িতে আসলে বিষয়টি তিনি তাকে অবহিত করেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তুমি তাকে অনুমতি দাও *(বুখারী হা/৪৭৯৬; মুসলিম হা/১৪৪৫)*। দুধসম্পর্কীয় চাচা যদি মাহরাম হন, সেখানে আপন চাচা ও মামা আরো ঘনিষ্ঠ মাহরাম *(তাফসীরে কাসেমী ১৩/২৯৮)*। কারণ হাদীছে চাচাকে পিতার সমমর্যাদা সম্পন্ন বলা হয়েছে *(বুখারী হা/৯৮৩; মিশকাত হা/১৭৭৮)* এবং খালাকে মায়ের মর্যাদা সম্পন্ন বলা হয়েছে *(আবূদাউদ হা/২২৭৮)*। যার অর্থ চাচা-মামা পিতারই পর্যায়ভুক্ত।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : মহিলারা কি রক্ত দান করতে পারবে?

-রিযওয়ান, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : ফিৎনার আশংকা না থাকলে শারঈ পর্দা রক্ষা করে প্রাপ্ত বয়স্কা সুস্থ নারী রক্তদান করতে পারে *(আহযাব ৩৩/৩২-৩৩)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ মুখস্থ করা কি আবশ্যিক?

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : আসমাউল হুসনা মুখস্থ করা আবশ্যিক নয়, বরং এগুলির মর্ম অনুধাবন করা আবশ্যিক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম আছে। যে ব্যক্তি এগুলি মুখস্থ করে রাখবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(বুখারী হা/৬৪১০; মুসলিম হা/২৬৭৭)*। এর অর্থ হ'ল ঐ নামগুলি অর্থ সহ মুখস্থ করবে পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের সাথে এবং আল্লাহ্র উপর অটুট নির্ভরতার সাথে *(ফাৎহুল বারী)*। উছায়মীন বলেন, এর অর্থ হ'ল এগুলি মুখস্থ করা, মর্ম অনুধাবন করা, নামের উদ্দেশ্য বুঝে আমল করা এবং সে অনুযায়ী আল্লাহ্র নিকট দো'আ করা *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/১২৩)*। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র জন্য সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে। সেসব নামেই তোমরা তাঁকে ডাক..' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : হজ্জে তিনটি ত্বাওয়াফ করতে হয়। প্রশ্ন হ'ল সবগুলি করা কি বাধ্যতামূলক?

-মুরসালীন, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : ত্বাওয়াফ মূলতঃ ৩টি। (১) ত্বাওয়াফে কুদূম। যা হজ্জের উদ্দেশ্যে কা'বায় পৌঁছে করতে হয়। (২) ত্বাওয়াফে ইফাযাহ। যা আরাফার ময়দানে অবস্থানের পর ঈদুল আযহার দিন বা পরের তিন দিনের মধ্যে করতে হয়। যা হজ্জের অন্যতম রুকন। (৩) ত্বাওয়াফে বিদা'। যা হজ্জ শেষে বিদায়কালে করতে হয়।

তামাত্তু' হাজীগণ ত্বাওয়াফে কুদূমের পর সাঈ করে থাকলে তিনি ত্বাওয়াফে ইফাযাহর পর পূর্ণ হালাল হয়ে সাথে সাথে দেশে রওয়ানা হ'তে পারবেন। এসময় সফরের গোছগাছ ব্যতীত অন্য কারণে দেরী হ'লে তাকে পুনরায় বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় এসে ত্বাওয়াফে কুদূম-এর সময় সাঈ করে থাকলে তাকে আর সাঈ করতে হবে না। কেবল 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করেই পূর্ণ হালাল হয়ে দেশে রওয়ানা হবেন। ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলাগণ বিদায়ী ত্বাওয়াফ ছাড়াই দেশে ফিরবেন। অতএব সর্বদা ৩টি ত্বাওয়াফ অপরিহার্য নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে দু'টি ত্বাওয়াফেও হজ্জ সম্পন্ন করা যায় *(দ্র. হজ্জ ও ওমরাহ বই ৮০, ১১২-১৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : ইমাম মাগরিবের ছালাতে তৃতীয় রাক'আতে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সালাম ফিরানোর পূর্বে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে তাকবীর বলায় মুক্তাদীগণ লোকমা প্রদান করেন। তখন ইমাম শেষ বৈঠকে বসে বাকী দো'আ পড়ে সহো সিজদা না দিয়ে সালাম ফিরিয়ে দেন। পরে মুছল্লীদের দাবীতে ইমাম দু'টি সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরান। উক্ত পদ্ধতি কি সঠিক হয়েছে?

-কাযী হারুনুর রশীদ, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতে ওয়াজিব তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' সুন্নাত হবে *(শাওকানী, আস-সায়লুল জাররা-র (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/২৭৪ পৃ.)*। বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী সহো সিজদা না দিলেও চলত। তবে দেওয়াতেও কোন ক্ষতি নেই। এজন্য সবাই নেকী পাবেন। উল্লেখ্য যে, এই দুই (সহো) সিজদা শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাকারী গণ্য হয় *(মুসলিম*

হা/৫৭১; মিশকাত হা/১০১৫)।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : যারা বিকলাঙ্গ ও নিজ হাতে খেতে পারে না তাদের উপর রামাযানের ছিয়াম কি ফরয?

-লাবীব, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ অক্ষম ব্যক্তি অন্যের সাহায্য নিয়ে ছিয়াম রাখতে পারলে রাখবে। নইলে চিররোগী হিসাবে প্রতিদিনের বিনিময়ে অর্ধ ছা' ফিদিয়া প্রদান করবে। তবে সামর্থ্য না থাকলে ফিদিয়া ওয়াজিব নয় *(মির'আত ৭/৩২)*। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : ছালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'পায়ের মাঝে কতটুকু ফাঁক রাখতে হবে?

-রাযিয়া তাবাসসুম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : দেহের স্বাভাবিক ভারসাম্য অনুযায়ী নিজের দুই পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখবে *(বুখারী হা/৭২৫; আবুদাঊদ হা/৬৬২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/৩৫৭)*। সমাজে প্রচলিত- 'দু'পায়ের মাঝে হাতের তালু পরিমাণ স্থান ফাঁকা রাখবে' কথাটির শরী'আতে কোন ভিত্তি নেই *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৮)*। এমনকি চার আঙ্গুল বা তার কম ফাঁকা রাখবে' কথাগুলি একেবারেই ভিত্তিহীন। বরং জামা'আতে দাঁড়িয়ে মুছল্লীগণ পরস্পরে পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে, সেটাই ছিল ছাহাবায়ে কেরামের নিয়মিত আমল *(মির'আত হা/১০৯২-এর ব্যাখ্যা, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ ৪/৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : সফররত অবস্থায় বিতর ছালাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা আছে কি?

-মুহাম্মাদ শামসুল হক, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সফরে বাহনের উপরে বিতর ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/৯৯৯; মুসলিম হা/৭০০)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সফরে বিতর ছালাত ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না *(যা-দুল মা'আদ ১/৪৭৩)*। অতএব সফরেও বিতর ছালাত আদায় করা সুন্নাত।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায়কালে স্বামী ডাকলে স্ত্রী কি ছালাত ত্যাগ করে স্বামীর ডাকে সাড়া দিবে?

-নাজনীন আখতার, বরমী, শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : প্রয়োজনে নফল ছালাত সংক্ষিপ্ত করে কিংবা ত্যাগ করেই সাড়া দিবে। কেননা যাদের আহ্বানে নফল ইবাদত পরিত্যাগ করার অনুমতি আছে তারা হ'লেন পিতা-মাতা ও স্বামী *(বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/২৫৫০; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' ৬/৪৮৭)*। স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীকে নফল ছিয়াম পালন করতে ও ফরয ছালাতে ক্বিরাআত লম্বা করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৫১৯৫; মিশকাত হা/২০৩১; আবুদাঊদ হা/২৪৫৯; আহমাদ হা/১১৭৫৯; ছহীহাহ হা/২১৭২)*। তবে একান্ত বাধ্যগত কারণ ব্যতীত ফরয ছালাত ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না *(উছায়মীন, শারহ রিয়াযুছ ছালেহীন, ৩০২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : শ্বশুর ছূফীবাদে বিশ্বাসী। তাছাড়া শ্বশুরবাড়ীর লোকজন ছেলে-মেয়েদের মাঝে চরম বৈষম্য করে এবং শাশুড়ী অশালীন ভাষায় গালি-গালাজ করে। এই ধরনের আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা কতটুকু আবশ্যক?

-খাদেমুল ইসলাম, জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : প্রচলিত ছূফী মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ, যার ব্যাপারে ইমামগণ সতর্ক করে গেছেন। নাছীবী বলেন, আমরা একদিন ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমাদের এলাকায় ছূফী মতবাদের কিছু লোক রয়েছে, যারা অনেক খায়। এরপর ক্বাছীদা আবৃত্তি করে এবং এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে যিকির শুরু করে। ইমাম মালেক বললেন, তারা কি শিশু? সে বলল, না। তিনি বললেন, তারা কি পাগল? সে বলল, না বরং আলেম-ওলামা। তিনি বললেন, কোন মুসলমান এমনটি করে বলে জানি না *(ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস ১/৩২৭)*। মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ দামেশকী বলেন, 'তিন শ্রেণীর মানুষের নিকট দ্বীন নিরাপদ নয়- ছূফী, গল্পকার ও বিদ'আতী' *(কাযী ইয়ায, তারতীবুল মাদারেক ৩/২২৬)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'কোন লোক যদি দিনের প্রথম প্রহরে ছূফী মতবাদ গ্রহণ করে, তাহ'লে তুমি তাকে যোহরের সময় হ'তে না হ'তেই একেবারে আহম্মক অবস্থায় পাবে' *(বায়হাক্বী, মানাক্বিবুশ শাফেঈ ২/২০৭)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ছূফী মতবাদে থাকবে, সে আর কখনো সঠিক আক্বীদায় ফিরতে পারবে না' *(ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস ১/৩২৭)*। তিনি বলেন, 'আমি ছূফীদের সংস্পর্শে গিয়ে কেবল দু'টি বিষয়ে উপকৃত হয়েছি। তারা বলে, 'সময় তরবারী তুল্য। তুমি যদি তাকে না কাটো তাহ'লে সে তোমাকে কাটবে। আর তুমি যদি আল্লাহকে নিয়ে ব্যস্ত না হও, তাহ'লে বাতিল তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবে' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ৩/১২৪)*।

অন্যদিকে রাসূল (ছাঃ) সন্তানদের প্রতি সমান ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩০১৯)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না' *(নিসা ৪/১১)*। এক্ষণে শ্বশুরবাড়ীর লোকদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও বদ আখলাকের কারণে তাদের সাথে চলাফেরা নিজের আক্বীদা ও আমলের জন্য নিরাপদ মনে না করলে তাদের থেকে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। তবে মুসলিম হিসাবে এবং নিকটাত্মীয় হিসাবে তাদের সাথে সদাচরণ বজায় রাখবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে হ'লেও তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করো *(ছহীহাহ হা/১৭৭৭)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : জনৈকা মহিলার আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি। সে অছিয়ত করে যেন তার ছাগলের বাচ্চাটি বড় হ'লে তার পক্ষ থেকে আক্বীক্বা দেওয়া হয়। এক্ষণে তার পক্ষ থেকে আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

-রাক্বীবুল ইসলাম, দারুশা, রাজশাহী।

উত্তর : তার অছিয়ত অনুযায়ী ছাগলের বাচ্চাটি দ্বারা আক্বীক্বা

দিতে হবে। কারণ প্রথমতঃ তার আক্বীক্বা হয়নি *(ছহীহাহ হা/২৭২৬)*। দ্বিতীয়তঃ তার অছিয়ত পূরণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা মীরাছ বণ্টনের পূর্বে অছিয়ত পূরণের নির্দেশ দিয়েছেন *(নিসা ৪/১২)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : জনৈক ব্যক্তি বিয়ের ১৪ বছর পর জানতে পারে যে, তার স্ত্রী তার দুধ বোন। এক্ষণে তাদের করণীয় কী?

-ইযহারুল ইসলাম, হাটিকুমরুল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : অনতিবিলম্বে বিবাহ বিচ্ছেদ করে আলাদা হয়ে যেতে হবে। কারণ দুধ বোন নিজ বোনের সমতুল্য। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে তার দুধ বোনের বিয়ে দিতে চাইলে তিনি বলেন 'দুধ পানের সম্পর্ক দ্বারা ঐসব লোক হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্ক দ্বারা হারাম হয়' *(বুখারী হা/২৬৪৫; মুসলিম হা/১৪৪৫)*। তবে এটা নিশ্চিত হ'তে হবে যে, দুই বছর বয়সের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচবার পৃথক পৃথক বৈঠকে তাকে পূর্ণভাবে দুধপান করানো হয়েছে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/১১৪)*। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে সন্তান থাকলে তারা ওয়ারিছ হিসাবে তাদের পিতা-মাতার সম্পদ পাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/১৩)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জায়গায় মাদ্রাসা নির্মাণ করা বা মসজিদের জন্য দানকৃত টাকা মাদ্রাসায় দেওয়া যাবে কী?

- শরীফুল ইসলাম, ইলিশমারী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : নিয়ম হ'ল দাতার নিয়ত মোতাবেক নির্ধারিত স্থানে ব্যয় করা *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফাৎওয়া ক্রমিক ১৩৮৭৪, ১৬/৩২ পৃ.)*। তবে শারঈ কল্যাণ থাকলে প্রয়োজনে ওয়াকফকারীর শর্ত পরিবর্তন করা জায়েয *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাত ৫০৯ পৃ.; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ৩/২২৭)*। এছাড়া কোন মসজিদের অতিরিক্ত টাকা অন্য কোন মসজিদে দান করা যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩১/০৬)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : হাত তুলে মুনাজাত করার পর মুখমণ্ডল মাসাহ করা যাবে কি?

-তাবীবুল ইসলাম, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।

উত্তর : মুনাজাত বা হাত তুলে দো'আ শেষে মুখমণ্ডল মাসাহ করার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) মুখে হাত মাসাহ করা সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনা করে তা যঈফ হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো পর্যালোচনা শেষে বলেন, 'দো'আর পর মুখে দু'হাত মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই' *(আলবানী, মিশকাত হা/২২৫৫-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে হাত তুলে দো'আ করার ব্যাপারে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মুখমণ্ডল মাসাহ করার ব্যাপারে এক বা দু'টি বর্ণনা এসেছে, যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/৫১৯)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : 'তোমরা ফজরের সময় ফর্সা কর। কেননা এটাই নেকীর জন্য উত্তম সময়' (তিরমিযী; আবুদাঊদ; মিশকাত হা/৬১৪)। হাদীছটির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-ওয়াহীদুযযামান, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত হাদীছের সারমর্ম হ'ল ফজরের ছালাত অন্ধকারে শুরু করতে হবে এবং দীর্ঘ কেরাআতের মাধ্যমে আকাশ ফর্সা হয়ে এলে ছালাত শেষ করতে হবে, যা অধিক ছওয়াব লাভের কারণ হবে। যেমন অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ফজরের ছালাতের মাধ্যমে ফর্সা করে দাও যাতে লোকেরা তাদের তীর নিক্ষেপের জায়গা দেখতে পায়' *(তাবারানী কাবীর হা/৪৪১৪; ছহীহুল জামে' হা/৯৬৯)*। সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, এর অর্থ হ'ল গালাসে প্রবেশ কর ও ইসফারে বের হও। অর্থাৎ ক্বিরাআত দীর্ঘ কর এবং ফর্সা হ'লে ছালাত শেষ করে বের হও, যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করতেন *(আবুদাঊদ হা/৩৯৩)*। তিনি ফজরের ছালাতে ৬০ হ'তে ১০০টি আয়াত পড়তেন। অথবা এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, 'তোমরা ফজর হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হও। ধারণার ভিত্তিতে ছালাত আদায় করো না' *(তিরমিযী হা/১৫৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮০ পৃ.)*। আলবানী বলেন, এর অর্থ এই যে, গালাসে ফজরের ছালাত শুরু করবে এবং ইসফারে শেষ করে বের হবে, যাতে লম্বা তেলাওয়াতের সুযোগ হয় এবং অধিক ছওয়াবের কারণ হয় *(ইরওয়া ১/২৮৭ পৃ.; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : পিতা-মাতা ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর আমি পিতার কাছে থাকি। মায়ের অন্যত্র বিবাহ হয়েছে এবং সাবালক সন্তান আছে। এক্ষণে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমি কাকে প্রাধান্য দিব?

-আব্দুল্লাহ আল-আমীন, টঙ্গী, ঢাকা।

উত্তর : সন্তানের জন্য মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করা অধিকতর প্রাধান্যযোগ্য *(বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮)*। কিন্তু মায়ের অন্যত্র বিবাহ হয়ে যাওয়ায় তার অনুপস্থিতিতে পিতা অগ্রাধিকার পাবেন। কেননা মায়ের পরেই পিতার স্থান *(ছহীহাহ হা/৩৬৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। তবে অন্যত্র বিয়ে হ'লেও জন্মদাত্রী মা হিসাবে তার প্রতি যথাসম্ভব সদাচরণ করবে ও খোঁজ-খবর রাখবে।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : স্বামী-স্ত্রী বা মাহরাম নারী-পুরুষ জামা'আতবিহীন অবস্থায় পাশাপাশি ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-রাফিন, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : উভয়ে আলাদা ছালাত আদায় করলে পাশাপাশি বা সামনে বা পিছনে যে কোন স্থানে দাঁড়ানোতে কোন দোষ নেই *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/২৫২)*। তবে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে নারী একাকী হ'লেও পিছনের কাতারে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/৩৮০; মুসলিম হা/৬৫৮)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : পিঁপড়া মারার ব্যাপারে শারঈ বিধান কি?

-আব্দুল মতীন, জলঢাকা, নীলফামারী।

www.at-tahreek.com

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ছুরাদ পাখি, ব্যাঙ, পিঁপড়া ও হুদহুদ পাখি মারতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাউদ হা/৫২৬৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪১৪৫; ছহীহুত তারগীব হা/২৯৯০)*। তবে মানুষকে কষ্টদানকারী পিঁপড়া মারা বৈধ *(ফাৎহুল বারী ৬/৩৫৮১; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৬৪)*। তাছাড়া যে কোন প্রাণীই বিনা কারণে মারা উচিৎ নয়। কেননা প্রতিটি প্রাণীই আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন এক নবীকে একটি পিঁপড়া কামড় দিলে তিনি পিঁপড়ার বসতি জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন আল্লাহ তার প্রতি অহি করলেন যে, তোমাকে একটি পিঁপড়া কামড় দিয়েছে, তাতেই তুমি সব পিঁপড়াকে মেরে ফেলার হুকুম দিলে? পিঁপড়া কি তাসবীহ পাঠ করে না? *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪১২২ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : জনৈক আলেম বলেন, পূর্বরাতে স্ত্রী সহবাসকারী পুরুষ কবরে নামতে পারবে না। এটা সঠিক কি? সঠিক হ'লে এর পিছনে কারণ কি? এছাড়া লুঙ্গী পরে কবর খনন করা যাবে না- এরূপ কোন বিধান আছে কি?

-ইমরান কবীর, সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার।

উত্তর : যে ব্যক্তি পূর্ব রাতে স্ত্রী সহবাস করেছে তার জন্য কোন নারীকে কবরে নামানো সমীচীন নয়; তবে নিষিদ্ধও নয়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কন্যার কবরের পার্শ্বে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে বসেন। আমি দেখতে পেলাম, তাঁর চোখ হ'তে অশ্রু ঝরছে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে গত রাতে স্ত্রীর নিকটবর্তী হওনি? আবু তালহা (রাঃ) বললেন, আমি। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কবরে নামো। অতঃপর আবু তালহা (রাঃ) কবরে নামলেন' *(বুখারী হা/১২৮৫; মিশকাত হা/৭১৫)*। এর মর্ম আল্লাহই ভালো জানেন। তবে উক্ত ব্যক্তির মনে শয়তান রাতের অবস্থাগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। যাতে মানসিক পবিত্রতার ঘাটতি হ'তে পারে *(ফাৎহুল বারী ৩/১৫৯; মির'আত হা/১৭২৯-এর ব্যাখ্যা)*। আর লুঙ্গী পরে কবর খনন করা যাবে না- এমন বক্তব্য বানোয়াট ও বেদলীল।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : আমি কখনো দাড়ি শেভ করিনি। বর্তমানে সেনাবাহিনীতে চাকুরী নিতে চাচ্ছি। কিন্তু তাদের নিয়ম হ' ল এক বছরের ট্রেনিং পিরিয়ডে প্রতিদিন দাড়ি শেভ করতে হবে। তারপর থেকে দাড়ি রাখা যাবে। এক্ষণে আমার এই চাকুরী নেওয়া জায়েয হবে কি? এর জন্য আমাকে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-হুমায়ুন কবীর, চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তর : হাদীছ বিরোধী কোন আদেশ মানতে মুসলমান বাধ্য নয়। অতএব সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার্থে জোরালো দাবী রাখতে হবে এবং সাধ্যমত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যদি কর্তৃপক্ষ সম্মত না হয়, তবে ভিন্ন রিযিক অনুসন্ধান করতে হবে *(শায়খ বিন বায, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৮/৩৭৬; বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক 'ইসলামে দাড়ি রাখার বিধান' নিবন্ধ)*।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : কোন ব্যক্তিকে অর্থ ঋণ দেওয়ার পর একসময় দেখা গেল তিনি ঋণ পরিশোধে পুরোপুরি অক্ষম। এমতাবস্থায় নিজের যাকাত থেকে উক্ত অর্থ কেটে রাখা যাবে কি? এছাড়া কাউকে কোন অর্থ দান করার পর পরবর্তীতে তা বাধ্যগত অবস্থায় গৃহীত ব্যাংক সূদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের সাথে সমন্বয় করা যাবে কি?

-ফাতেহুল হোসাইন, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : ঋণগ্রহীতাকে অবহিত না করে উক্ত টাকা যাকাত হিসাবে কেটে রাখা যাবে না। বরং প্রয়োজনে ঋণগ্রহীতাকে আরো সময় দিতে হবে অথবা হকদার হিসাবে তাকে যাকাতের সম্পদ থেকে দান করা যাবে। ঋণগ্রহীতা সেই অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করবে। তাতে কোন দোষ নেই *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/২১০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৮০-৮১)*। আর ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সূদ দ্বারা দানের অর্থ সমন্বয় করা অন্যায়। কারণ এটি পবিত্র সম্পদের সাথে অপবিত্র সম্পদ মিশ্রিত করার শামিল, যা সিদ্ধ নয় *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : ফরয বা নফল ছালাতের পর একাকী হাত তুলে নিয়মিত বা মাঝে মাঝে দো'আ করা যাবে কি? এসময় বাংলায় দো'আ করা যাবে কি?

-মাহীন, দাগনভূঞা, ফেনী।

উত্তর : ফরয বা নফল ছালাতের পর একাকী নিয়মিত হাত তুলে দো'আ করা সমীচীন নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) ও তার ছাহাবীগণ থেকে এমন নিয়মিত আমল প্রমাণিত নয়। তবে নফল ছালাতের পর বা যেকোন সময়ে 'আম হাদীছের ভিত্তিতে মাঝে মধ্যে হাত তুলে দো'আ করা জায়েয বা মুস্তাহাব। কারণ হাত তুলে দো'আ করা দো'আ কবুলের অন্যতম আদব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ অত্যাধিক লজ্জাশীল ও দাতা। যখন কোন ব্যক্তি তার দরবারে দুই হাত তুলে (প্রার্থনা করে), তখন তিনি তার হাত শূন্য বা বঞ্চিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন *(তিরমিযী হা/৩৫৫৬; মিশকাত হা/২২৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৩৫)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : স্বামীর দুধপিতা কি মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত?

-মুনতাছির মামুন চৌধুরী, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : চার মাযহাবের বিদ্বানগণের মতে, স্বামীর দুধপিতাও মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। কারণ বংশীয় কারণে যা হারাম হয়, দুধপানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয় *(বুখারী হা/২৬৪৫)*। তাদের মতে, দুধপানের কারণে বংশীয় সম্পর্কের মত বৈবাহিক সম্পর্কেও প্রভাব পড়ে। কেননা দু'টি সম্পর্ক একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ, নং ২১৭)*। তবে ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম ও উছায়মীনসহ কতিপয় বিদ্বান স্বামীর দুধপিতাকে মাহরাম হিসাবে গণ্য করেননি। কেননা হাদীছে এ ব্যাপারে স্পষ্ট উল্লেখ নেই *(যা-দুল মা'আদ ৫/১১৩; ফাতাওয়া মারআতুল মুসলিমাহ ২/৮৪১-৪২, ৩/৮২২; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩৬/২১৬, ৩৭/৩৬৮-৬৯)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : কোন কোন শ্রেণীর মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন?

-আয়নুল হক, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের সত্তুর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের কোন শাস্তি হবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, তারা কারা? তিনি বললেন, যারা শরীরের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়িয়ে দাগা দেয় না এবং (জাহেলী যুগের ন্যায়) ঝাড়-ফুঁক বা মন্ত্রের আশ্রয় নেয় না। বরং তারা আল্লাহ্র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে *(বুখারী হা/৬৫৪১; মুসলিম হা/২২০; মিশকাত হা/৫২৯৫)*। ঝাড়-ফুঁক অর্থ কুরআন-হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহের বিপরীত মন্ত্র পাঠ *(মিরক্বাত)*। রাসূল (ছাঃ) এর দো'আর বরকতে উপরোক্ত সত্তুর হাযারের প্রত্যেক হাযারের সাথে আরো সত্তুর হাযার করে মুসলমানকে আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাত দিবেন (যার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ) *(আহমাদ হা/৮৬৯২; ছহীহাহ হা/১৪৮৪)*। উক্ত হাদীছে তাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে- (১) তারা লোহা দিয়ে দাগা লাগিয়ে চিকিৎসা নেয় না (২) তারা মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করে না এবং (৩) সুলক্ষণ-কুলক্ষণে বিশ্বাস না করে সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখে। আর উক্ত বৈশিষ্ট্যধারী ব্যক্তিদেরকেই আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাত প্রদান করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : সরকার প্রদত্ত বৈশাখী ভাতা সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী, শিক্ষকদের গ্রহণ করা জায়েয হবে কী?

-শাকিল আহমাদ, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উৎসাহমূলক ভাতা গ্রহণে বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) সূদখোর ইহূদী-নাছারা ও মুশরিকদের হাদিয়াও গ্রহণ করতেন *(বুখারী ৯/৩৮৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৪৩)*। তবে যে উপলক্ষ্যে হাদিয়া প্রদান করা হয়, সে উপলক্ষ্য যদি হারাম হয়, তাতে অংশগ্রহণ করা নাজায়েয। অতএব বৈশাখী উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য এই ভাতা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। বরং এটি কোন বৈধ কাজে ব্যবহার করবে।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : সরকার প্রদত্ত শরী'আতসম্মত বৈষয়িক সিদ্ধান্ত সমূহ যেমন করোনা সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহ পুরোপুরি অনুসরণ করা আবশ্যক কি? না করলে গুনাহগার হতে হবে কি?

-ফুয়াদ মুস্তাবীন, কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া।

উত্তর : সরকারের সিদ্ধান্ত যদি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী না হয় এবং নাগরিকদের প্রতি যুলুম না হয়, তবে তা মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য নেতার প্রতি আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আর কোন আনুগত্য নেই *(বুখারী হা/৭১৪৪; মুসলিম হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/৩৬৬৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৭২)*। 'কেননা তাদের পাপ তাদের উপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের উপর বর্তাবে' *(মুসলিম হা/১৮৪৬; মিশকাত হা/৩৬৭৩)*। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, সুন্নাত হ'ল মুসলমানদের শাসকের আনুগত্য করা, সে নেককার হৌক বা বদকার হৌক যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দিবে *(লুম'আতুল ই'তিকাদ ৪০ পৃ.)*। তবে কোন সরকারী সিদ্ধান্ত যদি স্বেচ্ছাচারিতামূলক হয় এবং জনকল্যাণকর না হয়, তাহ'লে তা পালন করা আবশ্যক নয়। হাফেয ইবনু হাজার হায়তামী বলেন, 'রাষ্ট্র যে নির্দেশ দেয় তাতে যদি কল্যাণ না থাকে তাহ'লে তা পালন করা ওয়াজিব নয়। তবে সরকারী ফিৎনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রকাশ্যে পালন করবে' *(তোহ্ফাতুল মুহতাজ ৩/৭১)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : ডাক্তারের নিকটে কোন রোগের চিকিৎসা নেওয়ার পাশাপাশি শারঈ ঝাড়-ফুঁকের চিকিৎসা নেওয়া যাবে কি?

-আবু হুরায়রা ছিফাত, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ক্লিনিক্যাল চিকিৎসা নেওয়ার পাশপাশি শারঈ ঝাড়-ফুঁকের চিকিৎসা নেওয়া জায়েয। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এক সময় ঝাড়-ফুঁক নিষিদ্ধ করে দিলেন। অতঃপর 'আমর ইবনু হায্ম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের নিকট একটি ঝাড়-ফুঁক ছিল, যা দিয়ে আমরা বিচ্ছুর ছোবলে ঝাড়-ফুঁক করতাম, এখন আপনি তো ঝাড়-ফুঁক নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার ভাইয়ের কোনও উপকার করতে সমর্থ হ'লে সে যেন তার উপকার করে *(মুসলিম হা/২১৯৯; ছহীহাহ হা/৪৭২)*। 'আওফ বিন মালেক আল-আশজাঈ (রাঃ) বলেন, জাহেলী যুগে আমরা মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করতাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ সমস্ত মন্ত্র সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমাকে পড়ে শুনাও। (তবে কথা হ'ল) মন্ত্র দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে কোন আপত্তি নেই, যদি তার মধ্যে শিরকী কিছু না থাকে *(মুসলিম হা/২২০০; মিশকাত হা/৪৫৩০)*। উল্লেখ্য যে, কোন আয়াত বা দো'আ পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করা বা তা দ্বারা গোসল করা বা শরীরে পানি ছিটিয়ে চিকিৎসা নেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩৫০৯; নববী, শরহ মুসলিম ১৪/১৮২; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৫২)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : কুরআনে ইহূদীদের সম্পর্কে আয়াত থাকলেও হিন্দুদের সম্পর্কে কোন আয়াত না থাকার কারণ কি? আর হিন্দুদের মধ্যে যারা একেশ্বরবাদী এবং মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করে না, তাদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

-মুনীরুযযামান, ডেসকো, ঢাকা।

উত্তর : কুরআনে যেমন ইহুদী-খৃষ্টধর্মের মত একেশ্বরবাদী ইব্রাহীমী ধর্মগুলি বিকৃতি ও অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে, তেমনি হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের মত পৌত্তলিক ধর্মের অসারতাও প্রমাণ করা হয়েছে, যাদেরকে সাধারণভাবে মুশরিক কিংবা মূর্তিপূজক হিসাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে *(নজম ৫৩/১৯-২৩)*। সুতরাং কুরআনের হিন্দুদের সম্পর্কে বলা হয়নি এ ধারণা ভুল। আর মূর্তিপূজক না হ'লে

বা একেশ্বরবাদী হ'লেও কোন হিন্দু বা অমুসলিম যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না আনে, তবে সে নিঃসন্দেহে জাহান্নামী *(ফাৎহ ৪৮/১৩; মুসলিম হা/২৪০)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : আমার বড় ভাই জার্মানীতে বড় একটি বাসায় উঠতে যাচ্ছে, যেখানে ইতিপূর্বে একজন আত্মহত্যা করেছে এবং অন্যরা একে অপরে খুনাখুনী করে মারা গেছে। সম্ভবতঃ বাড়ীর নীচে কবর ছিল এবং বাড়ীর পিছনে কালো জাদু করা হ'ত। এরূপ বাড়ীতে উঠা নিরাপদ কি?

-তাহমীদ হোসাইন, বাজবটতলা, পাবনা।

উত্তর : এরূপ বাড়ীতে বসবাস করা উচিৎ নয়। কারণ জাদু দ্বারা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাসূল (ছাঃ)-কেও জাদু করে রোগাক্রান্ত করে দেওয়া হয়েছিল। পরে সূরা নাস-ফালাক নাযিল হলে এর মাধ্যমে চিকিৎসা নিলে তিনি সুস্থ হন *(সূরা নাস ও ফালাক্বের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। তাছাড়া কোন বাড়ীর নিচে কবর থাকলে সে বাড়ীতে বসবাস করা নিষিদ্ধ। জাবের (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কবর চুনকাম করা, তার উপর বসা এবং তার উপর ভবন নির্মাণ করা হ'তে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭০; মিশকাত হা/১৬৭০)*। অতএব ভবনের নীচে কবর থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হ'লে সেখানে বসবাস করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, কোন বাড়ীতে কেউ আত্মহত্যা করলে বাড়ীটিকে অভিশপ্ত মনে করা বা সেখানে প্রেতাত্মা ভর করে থাকে এমন ধারণা করা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : তারাবীহর ছালাত আমি একাকী পড়ি। এক্ষেত্রে সূরা মুখস্ত কম থাকায় কুরআন দেখে পড়া যাবে কী?

-সিরাজুল ইসলাম, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : তারাবীহসহ যেকোন নফল ছালাতে কুরআন দেখে পড়া যায়। আয়েশা (রাঃ)-এর গোলাম যাকওয়ান রামাযান মাসে কুরআন দেখে আয়েশা (রাঃ)-এর ইমামতি করেছেন *(বুখারী, 'আযান' অধ্যায়, ৫৪ অনুচ্ছেদ; বায়হাক্বী হা/৩১৮৩)*। তবে ছালাতে কুরআন মুখস্থ পড়াই উত্তম। কেননা এতে ছালাতে খুশূ-খুযূ বিঘ্নিত হয় না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১১৭)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলে তার মাধ্যমে সারারাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী অর্জিত হয় মর্মে কোন ছহীহ আছে কি?

-দলীলুর রহমান, কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ছালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল, সে যেন সারারাত্রি ব্যাপী ছালাত আদায় করল' *(মুসলিম হা/৬৫৬; মিশকাত হা/৬৩০)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : কল্পনাশ্রিত গল্প, উপন্যাস, কবিতা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখার ক্ষেত্রে ইসলাম কতটুকু অনুমোদন দেয়?

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামী আক্বীদা-আমল ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার এবং শারঈ বিধানকে সহজভাবে তুলে ধরার জন্য গল্প, উপন্যাস বা কল্পকাহিনি রচনা করা যায়, যা মূলতঃ মিথ্যার পর্যায়ভুক্ত নয় বরং বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য উপমা, উদাহরণ বা সাদৃশ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) শর্তহীনভাবে বনু ইস্রাঈলদের কাহিনী বর্ণনা করতে বলেছেন, যা সত্য-মিথ্যা উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে। কুরআনেও অনেক অনির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা সাদৃশ্য প্রদানের নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়েছে *(যুমার ৩৯/২৯)*। অতএব সদুদ্দেশ্যে এবং কারু প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে বা মূল সত্যের বিকৃতি না ঘটিয়ে এ ধরণের উপদেশপূর্ণ কল্প-কাহিনী রচনা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ বিদ্বান একমত। তবে মাসআলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে সতর্ক থাকতে হবে। আর সেই সাথে কোনভাবে মিথ্যা ও বাতিল আক্বীদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই ধরনের কিছু রচনা করা যাবে না *(ছান'আনী, আর-রওযুল বাসেম ১/১০১; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ, ক্রমিক ৭৭, প্রশ্ন ক্রমিক ১০)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : আমার পিতাসহ অনেক মানুষকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখায় সবসময় আমি মৃত্যুচিন্তায় মগ্ন থাকি। ফলে আমার সার্বিক জীবন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কি কি আমল করলে এই অযাচিত ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে জানতে চাই।

-সানজীদা আখতার, চৈতাব, নরসিংদী।

উত্তর : সুখী হওয়ার একমাত্র উপায় হ'ল তাক্বদীর ও তাওয়াক্কুল। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ফয়ছালা তথা তাক্বদীরকে মেনে নিতে হবে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর সিদ্ধান্তের মধ্যে অবশ্যই কল্যাণ রয়েছে। অতঃপর সকল কাজে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্‌র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(তওবা ৯/৫১)*।

তাছাড়া অধিক যিকর-আযকার ও ফরয ইবাদতের পাশাপাশি নফল ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা 'রাসূল (ছাঃ) যখন সংকটে পড়তেন, তখন ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন' *(আবুদাঊদ হা/১৩১৯; ছহীহুল জামে' হা/৪৭০৩)*। আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে। আর তা অবশ্যই কঠিন কাজ, তবে বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) বিপদের সময় নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেন, *লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল 'আযীমুল হালীম; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল 'আরশিল 'আযীম; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতে ওয়া রাব্বুল 'আরযে রাব্বুল 'আরশিল কারীম* (সালাফগণ এটিকে 'দো'আউল কারব' বা বিপদের দো'আ বলতেন) *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৪১৭ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ)*। বিপদকালে রাসূল (ছাঃ) নিম্নের দো'আটিও পড়তেন, *ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূম, বিরহমাতিকা আস্তাগীছু* (হে চিরঞ্জীব! হে সবকিছুর ধারক! আমি তোমার রহমত কামনা করছি) *(তিরমিযী হা/৩৫২৪; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৭৭)*।

www.at-tahreek.com

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : হযরত ঈসা (আঃ)-কে মাসীহ বলা হয় আবার দাজ্জালকেও মাসীহ বলার কারণ কি?

-মেহরাব হোসাইন, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : মাসীহ শব্দটি এসেছে 'মাসাহ' থেকে। যার অর্থ স্পর্শ করা বা মোছা। ঈসা (আঃ)-কে মাসীহ বলা হয় এজন্য যে, তাঁর হাতের স্পর্শে আল্লাহ্র হুকুমে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করত। এমনকি মৃত ব্যক্তি জীবন লাভ করত *(আলে ইমরান ৩/৪৯)*।

অন্য দিকে দাজ্জালকেও মাসীহ বলা হয়েছে। কারণ তার এক চোখ লেপন করা থাকবে। সেও আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবিত করতে পারবে *(মুসলিম হা/২৯৩৩; মিশকাত হা/৫৪৭৩)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : সালাম ফিরানোর সময় চোখ কোন দিকে থাকবে? কাঁধের দিকে না যেকোন স্থানে? বিস্তারিত জানতে চাই।

-রাব্বী হোসাইন, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সালাম ফিরানোর সময় মুছল্লী স্বাভাবিকভাবে ডানে ও বামে দৃষ্টিপাত করে সালাম ফিরাবে *(মুসলিম হা/৪৩১)*। আর যদি একাকী ছালাত আদায় করে, তাহ'লে ডানে ও বামে থাকা ফেরেশতাদেরকে সালাম প্রদানের নিয়ত করবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪৫৬, ৪৬২; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/২০৮)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : হায়েযের শেষ সময় বুঝার আলামত কী কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : হায়েযের শেষ সময় দু'ভাবে বোঝা যায়। প্রথমতঃ হয়তবা শ্বেতস্রাব বা সাদা তরল পদার্থ নির্গত হবে, যা জরায়ু থেকে বের হয়। অথবা রক্ত এমনভাবে বন্ধ হবে যে, কাপড় বা টিস্যু ব্যবহার করলে তাতে লাল, হলুদ বা খয়েরী রঙ-এর কোন প্রকার তরল পদার্থ আসবে না। এরপর গোসল করে ছালাত আদায় করবে। মহিলা ছাহাবীগণ আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে পাত্রে করে তুলা পাঠাতেন যাতে হলদে রঙ-এর পদার্থ থাকতো। তিনি বলতেন, 'তোমরা শ্বেতস্রাব না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবে না' *(বায়হাক্বী হা/১৫৮৯; ইরওয়া হা/১৯৮)*। আর যদি একবার পরিচ্ছন্ন হওয়া তথা গোসল করে পবিত্রতা অর্জনের পরও এই হলদে বা খয়েরী রঙ-এর পদার্থ আসে, তাহলে তা ধর্তব্য হবে না বরং এ অবস্থায় ছালাত আদায় করবে। কারণ তা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে না *(বুখারী হা/৩২৬; আবুদাঊদ হা/৩০৭)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের গেম খেলার ব্যবস্থা আছে। যা খেলে সব বয়সের মানুষ প্রচুর সময়ের অপচয় করে। এগুলো খেলা জায়েয হবে কি?

-মশীউর রহমান, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : বৈধ অনেক খেলা সাধারণভাবে জায়েয হলেও যদি তা অনর্থক সময় নষ্টের কারণ হয় বা ইবাদতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বর্তমানে মোবাইলসহ বিভিন্ন ডিভাইসে রক্ষিত গেম সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। যাতে বিনোদনের চাইতে ক্ষতি বেশী রয়েছে। তাছাড়া এতে ইবাদত পালনেও গাফলতি আসে। সাধারণভাবে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে খেলাধুলা জায়েয হ'তে পারে- (১) আল্লাহ্র যিকর ও ছালাত থেকে বিরত না রাখা, (২) মূল্যবান সময়ের অপচয় না হওয়া, (৩) খেলার মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও দুশমনী সৃষ্টি না হওয়া, (৪) টাকা-পয়সার হার-জিত না থাকা তথা জুয়া না হওয়া, (৫) কোন প্রকার অশ্লীলতা বা শরী'আতের সীমালংঘন না হওয়া *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৩৯১ 'প্রতিযোগিতা' অনুচ্ছেদ)*।

বলা বাহুল্য, উক্ত শর্তসমূহ মেনে মোবাইল গেম খেলা প্রায় অসম্ভব। অতএব এসব খেলা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : আমাদের মসজিদের ইমাম প্রায়ই ছালাতের মধ্যে ঘুমান, প্রচুর ভুল করেন, সিজদা কখনো একটি, কখনো তিনটি দেন। আবার ভুল সংশোধনের জন্য সহো সিজদাও ঠিক মতো দেন না। অনেক বলার পরও সংশোধন হচ্ছে না। এরূপ ইমামের পিছনে ছালাত হবে কি?

-শিহাবুদ্দীন, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ ভুলের জন্য ইমাম দায়ী হবেন। তবে তার পিছনে ছালাত হয়ে যাবে। ইমাম সংশোধন না হ'লে মসজিদ কমিটির কর্তব্য হবে, তাকে বাদ দিয়ে অন্য ইমাম নিয়ে আসা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন জন ব্যক্তির ছালাত তার মাথার উপরে এক বিঘতও উঠে না (অর্থাৎ তার ছালাত কবুল হয় না)। যে ব্যক্তি ইমামতি করে, অথচ মুছল্লীরা তাকে অপসন্দ করে... *(ইবনু মাজাহ হা/৯৭১; মিশকাত হা/১১২৮ হাদীছ হাসান)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : আমার ছেলের বউ নিয়মিত ছালাত আদায় করে না এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকদের সাথে মন্দ আচরণ করে। মেয়ের পিতা-মাতাকে বলার পরও কোন ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আমীর হোসাইন, কুষ্টিয়া।

উত্তর : নিয়মিত ছালাত আদায় করার ব্যাপারে স্বামী ও পরিবারের সদস্যগণ তাকে বারবার নছীহত করবে। অধিক নছীহতের মাধ্যমে স্ত্রীর মনের বক্রতা দূর করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নারীদেরকে উত্তম নছীহত কর। কেননা নারী জাতিকে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহ'লে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে তা সব সময় বাঁকাই থাকবে। অতএব নারীদের নছীহত করতে থাক' *(বুখারী হা/৩৩৩১; মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৮)*। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ইসলাম অতীব গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ সম্পর্ক যেন সহজে বিচ্ছিন্ন না হয়, সে লক্ষ্যে উভয়পক্ষকে আন্তরিক ও সমঝোতাকামী হ'তে হবে। যদি সর্বাত্মক চেষ্টার পরও কোনভাবেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তবে সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে উভয়পক্ষের শালিসের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে *(নিসা ৪/৩৪-৩৫)*।

www.at-tahreek.com

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১

নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১০ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। **নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।**
বিষয়গুলির ১, ২ ও ৩ নং মৌখিকভাবে এবং ৪ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।
(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।
৩. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
৪. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই (যাদু নয় বিজ্ঞান ও শব্দ অনুসন্ধান বাদে)।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১০+ থেকে ১৩ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৩ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। **নিম্নের ৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।**
বিষয়গুলির ১, ২, ৩ ও ৪ নং মৌখিকভাবে এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

১. আক্বীদা (আবশ্যিক সম্পূর্ণ) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৪ ও ২৫ তম পারা)।
৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।
(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা কাহফ ১০৭-১১০ আয়াত। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।
৪. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।
৫. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : (এমসিকিউ পদ্ধতিতে) (ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।
(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর ১. সম্পাদকীয় : অনুসরণ করব কাকে?, ৪৩তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '২০; জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, ৪৫তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, '২১; সময়ের সদ্ব্যবহার, ৪৬তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল '২১।
২. প্রবন্ধ : শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা, ৪২-৪৭তম সংখ্যা।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৮. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৪. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১৫. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৮ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৫ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২২শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১১ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুন ২০২১ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুন	১৯ শাওয়াল	১৮ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৪	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮
০৩ জুন	২১ শাওয়াল	২০ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৪	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৯
০৫ জুন	২৩ শাওয়াল	২২ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৪	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১০
০৭ জুন	২৫ শাওয়াল	২৪ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৩	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৫	০৮:১১
০৯ জুন	২৭ শাওয়াল	২৬ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৩	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৫	০৮:১২
১১ জুন	২৯ শাওয়াল	২৮ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৩	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১৩
১৩ জুন	০২ যুলক্বা'দাহ	৩০ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৩	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৪
১৫ জুন	০৪ যুলক্বা'দাহ	০১ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৪৩	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৮	০৮:১৫
১৭ জুন	০৬ যুলক্বা'দাহ	০৩ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৪৩	১১:৫৯	০৩:১৮	০৬:৪৮	০৮:১৫
১৯ জুন	০৮ যুলক্বা'দাহ	০৫ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৪	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৯	০৮:১৬
২১ জুন	১০ যুলক্বা'দাহ	০৭ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৪	১২:০০	০৩:১৯	০৬:৪৯	০৮:১৬
২৩ জুন	১২ যুলক্বা'দাহ	০৯ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৫	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৪৯	০৮:১৭
২৫ জুন	১৪ যুলক্বা'দাহ	১১ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৪৫	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৫০	০৮:১৭
২৭ জুন	১৬ যুলক্বা'দাহ	১৩ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৪৬	১২:০১	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
২৯ জুন	১৮ যুলক্বা'দাহ	১৫ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৪৭	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫০	০৮:১৭

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	-১	-২	-১
গাযীপুর	০	০	+১	০	০
শরীয়তপুর	+২	০	-১	-২	-২
নারায়ণগঞ্জ	০	০	-১	-২	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৪	+২	+৩
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	+১	-১	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	+১	-১	-১	-২	-২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৩	+৩
মাদারীপুর	+৩	+১	০	-১	-২
গোপালগঞ্জ	+৫	+২	+২	০	-১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+১	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	-২	+২	+৬	+৩	+৫
ময়মনসিংহ	-৩	০	+৩	+২	+৩
জামালপুর	-২	+২	+৬	+৪	+৫
নেত্রকোণা	-৫	-১	+২	০	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৪	+৩	+২
সাতক্ষীরা	+৯	+৫	+৫	+২	+১
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৬	+৭
নড়াইল	+৬	+৪	+৩	+১	+১
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬	+৪	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৪	+৩
খুলনা	+৭	+৩	+৩	০	০
বাগেরহাট	+৬	+২	+২	-১	-২
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৫	+১	+১	-২	-৩
পটুয়াখালী	+৫	০	+১	-৪	-৫
পিরোজপুর	+৬	+২	+২	-২	-৩
বরিশাল	+৪	০	০	-৩	-৪
ভোলা	+৩	-১	-১	-৪	-৫
বরগুনা	+৭	+১	+২	-৩	-৪

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৩	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৬	+৪	+৫
বগুড়া	+১	+৪	+৮	+৬	+৭
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৭	+৯
নাটোর	+৪	+৬	+৮	+৬	+৭
জয়পুরহাট	+১	+৫	+১০	+৮	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৯	+১২	+৯	+১২
নওগা	+৩	+৬	+৯	+৬	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	-১	+৭	+১৫	+১২	+১৬
দিনাজপুর	+১	+৭	+১৩	+১০	+১৩
লালমণিরহাট	-৩	+৪	+১০	+৮	+১১
নীলফামারী	-১	+৬	+১৩	+১০	+১৩
গাইবান্ধা	-১	+৩	+৮	+৬	+৮
ঠাকুরগাঁও	০	+৮	+১৫	+১২	+১৫
রংপুর	-২	+৪	+১১	+৮	+১১
কুড়িগ্রাম	-৪	+৩	+৯	+৭	+৯

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-২	-৩	-৪	-৫	-৫
ফেনী	-১	-৪	-৫	-৬	-৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৩	-৭	-৭	-১১	-১১
নোয়াখালী	+১	-৩	-৩	-৬	-৬
চাঁদপুর	+১	-১	-২	-৩	-৩
লক্ষ্মীপুর	+১	-২	-২	-৫	-৫
চট্টগ্রাম	-১	-৬	-৫	-১০	- ১১
কক্সবাজার	+১	-৬	-৫	-১২	-১৪
খাগড়াছড়ি	-৪	-৬	-৭	-৯	-৯
বান্দরবান	-২	-৭	-৭	-১২	-১৩

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৯	-৬	-২	-৪	-৩
মৌলভীবাযার	-৭	-৬	-৩	-৫	-৪
হবিগঞ্জ	-৬	-৪	-২	-৩	-৩
সুনামগঞ্জ	-৮	-৪	০	-২	০

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বই সমূহ

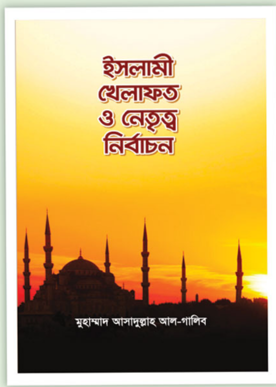

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচত্বর), ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো,) ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।
Email : tahreek@ymail.com ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 24, Issue 9, June 2021

ইয়াতীমখানা ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত সুধী! ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা ‘ইয়াতীমখানা ভবন’-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত নির্মাণ কাজে আর্থিক সহযোগিতার জন্য দেশ-বিদেশের দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

১. পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

২. আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড
হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

৩. বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

নির্মাণাধীন ইয়াতীমখানা ভবন

যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪

Sony Enterprise

সনি এন্টারপ্রাইজ

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইম আলী (সনি)
মোবাইল : ০১৭১২-০১৫৩৭০

এখানে জমি ও প্লট সহজ ও সূদ বিহীন কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

এখানে রড, এঙ্গেল, বার, সীট এবং যাবতীয় স্টীল সামগ্রী ও সিমেন্ট পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

নওদাপাড়া, আমচত্বর থেকে ১০০ গজ পশ্চিমে, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক (তিলোত্তমা) এর পার্শ্বে
পোঃ সপুরা, থানা : শাহমখদুম, রাজশাহী। ম্যানেজার : ০১৯২৬-৩৫৭৩৩৫, ০১৯১০-৭২৪৬৬৬।

FR

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম

সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

যোগাযোগ
১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট
রাজশাহী, ফোন: ০৭২১-৭৭২১৬৫, ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com
মোবাইল : ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩, ০১৭১১-৮১৫৯০২